গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং বিষয়ক

# গাইডবুক

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

ujjiban
SOCIAL AND BEHAVIOR CHANGE COMMUNICATION PROJECT

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

# সূচিপত্র


১. প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং ও কাউন্সেলিং পদ্ধতি ........ ০১
- প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং
- প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং করার সময় যে সব বাধা আসতে পারে
- প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং এর মূলনীতি
- কাউন্সেলিং এর সময় যোগাযোগ উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা

২. নারী পুরুষের বিয়ে ও বৈবাহিক সম্পর্ক ........ ০৫
- বৈবাহিক সম্পর্ক
- বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা

৩. নারী ও পুরুষ এবং তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ........ ০৯
- প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান
- প্রজনন অধিকার
- যৌন ও প্রজনন বিষয়ক ১২টি অধিকার
- প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষের অংশগ্রহণ

৪. যৌনতা এবং যৌন সম্পর্ক........ ১৩
- যৌনস্বাস্থ্য ও যৌনতা
- প্রজনন স্বাস্থ্য
- স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের কাজ
- মাসিক চক্র (Menstrual cycle)

৫. যৌনবাহিত সংক্রমণ........ ১৭
- যৌনবাহিত সংক্রমণ
- যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়
- কাদের যৌনবাহিত সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেশি
- প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- এইচআইভি
- এইডস
- এইচআইভি ও এইডস -এ আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ
- মানুষের শরীরে এইচআইভি যেভাবে ছড়ায় এবং যেভাবে ছড়ায় না

৬. যুব বয়সের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ........ ২১
- খাদ্য
- পুষ্টি
- সুষম খাদ্য
- সুষম খাদ্যের উপাদান ও উৎস
- অপুষ্টি প্রতিরোধে করণীয়

৭. পরিকল্পিত এবং সঠিক সময়ে সন্তান নেওয়ার সুবিধা ........ ২৫
- পরিককল্পিত এবং সঠিক সময়ে সন্তান নেওয়ার সুবিধা
- বিয়ের পর অবাঞ্ছিত গর্ভাবস্থা প্রতিরোধ
- সন্তান ধারণের জন্য নারীর উপযুক্ত ও নিরাপদ বয়স

৮. সমঝোতায় সুখের সংসার........ ২৯
- দাম্পত্য জীবনে কোন সমস্যা দেখা দিলে করণীয়
- বিয়ের পরে সুখ
- পারস্পরিক আকর্ষণ বাড়ানো এবং বন্ধন মজবুত করা
- সংসারের ব্যবস্থাপনা

৯. পরিবার পরিকল্পনা........ ৩৭
- পরিবার পরিকল্পনা: জন্মবিরতিকরণ
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ
- পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা
- প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
- গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা
- গর্ভপাত পরবর্তী সেবায় নারীর নিজের ও পুরুষের ভূমিকা

১০. মায়ের স্বাস্থ্য ও নবজাতকের যত্ন ........ ৪৩
- গর্ভকালীন সেবা
- প্রসব পরবর্তী সময়ে সেবা
- প্রসূতি মায়ের কি কি যত্ন নিতে হবে?
- গর্ভকালীন ৫টি জটিল অবস্থা
- নবজাতক
- বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যুর প্রধান কারণ
- নবজাতকের বিপদ চিহ্ন

১১. জেন্ডার ও নারীর প্রতি সহিংসতা........ ৪৯
- জেন্ডার ধারণা
- নারী নির্যাতন
- নির্যাতনের কুফল সমূহ
- কীভাবে নির্যাতন কমানো/প্রতিরোধ করা যায়
- নারীর বয়সভিত্তিক জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্র
- পরিবার ও সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব
- পরিবারে বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে করণীয়
- জেন্ডার বৈষম্য দূর করার উপায় এবং পুরুষের ইতিবাচক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার উপায়

১২. সন্তানের অভিভাবক হিসেবে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ ........ ৫৭
- যেভাবে একজন বাবা-মা সন্তানের ভালো অভিভাবক হয়ে উঠতে পারেন
- বাবার সাথে সন্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্ব
- সন্তানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বাবার ভূমিকা
- প্রসূতি ও নবজাতকের যত্নে পুরুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

# ১.

# প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং ও কাউন্সেলিং পদ্ধতি

মনস্তত্ত্ববিদেরা মনে করেন সুস্থ ও উন্নত বিবাহিত জীবন পেতে হলে অবশ্যই প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং বা পরামর্শ নেওয়া দরকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবাহিত জীবনে দু'জন মানুষের মধ্যে যেসব সমস্যা দেখা যায়, তার অনেকটাই আসে ভুল প্রত্যাশা থেকে এবং বিয়ে-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানার কারণে। প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং-এর সাহায্যে এই বিষয়গুলোর মোকাবিলা করা যায়। এই কারণেই একজন পরিবার কল্যাণ কর্মী হিসেবে ভবিষ্যৎ দম্পতিকে সঠিক পরামর্শ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে কাউন্সেলিং কী এবং কোন পদ্ধতিতে প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

## প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং

কাউন্সেলিং জেনে শুনে বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। বিশেষ করে মানুষ যখন নতুন পরিবেশে বা অবস্থানে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন কাউন্সেলিং সেই অবস্থা থেকে উত্তরণে সাহায্য করে । এটা এমন একটা প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা যা মানুষকে তাদের নিজেদেরকে ভালো করে চিনতে শেখায় বা বুঝতে শেখায়। আর সেই সঙ্গে আমরা যে বিরূপ বা জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করছি সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মনে স্বচ্ছ ধারণার জন্ম দেয়। এর সাহায্যে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা বা বোধ গড়ে ওঠে, নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল হয়ে উঠি এবং গঠনমূলক উপায়ে প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে সক্ষম হই।

কাউন্সেলিং ক্লায়েন্টের আচার-আচরণে পরিবর্তন আনে, আত্মনির্ভরতা ও মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে। এসব কিছুই একজন মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করে এবং জীবনের সফলতার সাথেও এর গভীর যোগাযোগ রয়েছে।

অবিবাহিত যুবক বা যুবতীদের বিয়ে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে কাউন্সেলিং করার সময় সঠিক তথ্য দিয়ে তাদের সাহায্য করতে হবে। বিবাহ কোনো জটিল বা বিরূপ পরিস্থিতি নয়। এটি মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া – যার মাধ্যমে মানুষ জীবনের একটি নতুন অধ্যায়/ধাপে/পরিবেশে/নতুন জীবনে প্রবেশ করে। এটি পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের চুক্তি বা অঙ্গীকার। পারস্পরিক আশা, ভরসা, নির্ভরতা ও অঙ্গীকারের সমন্বয়। এতে পরস্পরকে খাপ খাওয়াতে হয়। না পারলে বিরোধের আশঙ্কা থেকেই যায়। দ্বন্দ্ব ও বিরোধ মীমাংসা না হলে তা থেকে অশান্তি, অস্থিতিশীলতা, নির্যাতন ও চূড়ান্ত পর্যায়ে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। বিবাহপূর্ব কাউন্সেলিং এক্ষেত্রে যুব বয়সীদের সাহায্য করতে পারে।

বিয়ের জন্য উপযুক্ত বয়স কোনটি বা বিয়ের পর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কীভাবে করতে হবে, সেই বিষয়ে কাউন্সেলিং সহায়তা করবে। সাধারণত দেখা যায় বিয়ের পাত্র-পাত্রীরা তাদের সঙ্গী কেমন হবে, পরিবারের সদস্যরা কেমন হবে, যৌন জীবন কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। কাউন্সেলরের দায়িত্ব হবে তাদের কী কী সমস্যা আছে তা প্রথমে চিহ্নিত করা এবং সমস্যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা যেন তারা বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য পায় ও তাদের চাহিদা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অনেক সময় বিয়ে নিয়ে যুববয়সীদের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়, যা নিরসন করা জরুরি। আবার অতীতের কোন অভিজ্ঞতাও তাদের বর্তমান আচরণ এবং সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক সময় কেউ কেউ কোনো একটা বিষয় নিয়ে ভবিষ্যৎ আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কাউন্সেলিং তাদের জীবনের হতাশা, উৎকণ্ঠা বা ভুল ধারণা দূর করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে।

## প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং করার সময় যে সব বাধা আসতে পারে

প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং-এর সময় সামনাসামনি মৌখিক যোগাযোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে কাউন্সেলরকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তাকে সাহায্য করতে হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যক্তির জীবনের সমস্যার সমাধানে কাউন্সেলর অনেকগুলো দিক নির্দেশনা বা উদাহরণ তুলে ধরেন, যা থেকে ব্যক্তি তার জন্য উপযুক্ত নির্দেশনাটি বেছে নেন এবং নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে যে বাধা আসতে পারে-

- কাউন্সেলরের নিজের প্রস্তুতি না থাকলে
- ক্লায়েন্টের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক হতে না পারলে
- কাউন্সেলরের নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস কম থাকলে
- বিষয় সম্পর্কে কাউন্সেলরের সার্বিক জ্ঞান না থাকলে
- কাউন্সেলর এবং অবিবাহিত যুবক-যুবতীর মধ্যে বয়সের বেশি পার্থক্য থাকলে
- গ্রহীতার চাহিদা/প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে
- বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে না পারলে
- বার্তা উপলব্ধি করতে না পারলে
- ক্লায়েন্টের গোপনীয়তা বজায় রাখতে না পারলে
- স্পর্শকাতর বিষয়গুলো সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে না পারলে
- অংশগ্রহণকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা না থাকলে বা বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারলে
- কৌশলগত দিক, ভাষার ব্যবহার, উপকরণের যথাযথ ব্যবহার করতে না পারলে
- নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ক্লায়েন্টের উপর প্রভাব খাটালে

- ক্লায়েন্টের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে না পারলে
- নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাতে পারলে
- ক্লায়েন্টের প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করলে
- সবজান্তা ভাব, গর্বিত বা উদ্ধত ভাব প্রদর্শন করলে।

ক্লায়েন্টের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও আন্তরিকতার সাথে কথা বলে কাউন্সেলিং-এর অনেক বাধা দূর করা যায়।

## প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং-এর মূলনীতি

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, কাউন্সেলিং একটি প্রক্রিয়া যা প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের সিদ্ধান্ত নিতে এবং সিদ্ধান্তগুলি চর্চা করতে সহায়তা করে। গুণগত ও কার্যকর কাউন্সেলিং-এর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে ক্লায়েন্ট-কেন্দ্রিক পরামর্শ প্রদান।

বিয়ের উপযুক্ত বয়সে উপনীত যুবক-যুবতীদের কাউন্সেলিং-এ ইতিবাচক ফলাফল আনতে অর্থাৎ কাউন্সেলিং-এর উদ্দেশ্য সফল করতে যার সাথে কাউন্সেলিং করা হচ্ছে তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাউন্সেলর আগ্রহ নিয়ে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে কথা বলা শুরু করতে পারেন এবং ফলো-আপসহ কাউন্সেলিং এর প্রত্যেকটি ধাপে যুবক-যুবতীদের গুরুত্ব দিয়ে ভালো ব্যবহার ও সম্মান দেখিয়ে ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতে পারেন।

প্রাক-বৈবাহিক সময়ে যুবক-যুবতীদের কার্যকর কাউন্সেলিং-এর আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে তাদের চাহিদা বোঝা এবং সেইভাবে তাকে তথ্য দেয়া। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বিবাহ সম্পর্কিত ভাবনা বা আশংকাগুলো সবার একই রকম হবে না। পরিবেশ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিস্থিতির উপর চাহিদা নির্ভর করে। একজন সফল কাউন্সেলরকে সবকিছু বিবেচনা করে চাহিদা বের করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রদান করতে পারলে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। শুধু সঠিক তথ্য না জানার কারণে অনেক কিশোরী ও নারী বিয়ের প্রথম রাত থেকেই গর্ভধারণের দিকে এগিয়ে যায়। আবার তথ্য না থাকার কারণেই দেখা যায় একজন অপুষ্ট মা অপুষ্ট শিশুর জন্ম দিচ্ছে কিংবা গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব

## কাউন্সেলিং-এর মূলনীতি

- ভালো ব্যবহার ও সম্মান দেখানো
- সুসম্পর্ক স্থাপন করা
- উপযুক্ত তথ্য প্রদান করা
- পছন্দ অনুযায়ী তথ্য দেওয়া
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সাহায্য করা
- বুঝতে ও মনে রাখতে সাহায্য করা।

পরবর্তী সময়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্যগত জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন, এমন কি অকালে মারা যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে যে, কাউন্সেলর যেন কিছুতেই নিজের মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে না দেন। বরং জীবন ঘনিষ্ট উপযুক্ত উদাহরণ ও তথ্য দিয়ে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেন এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী সেবা প্রদান করেন। কাউন্সেলরের আরেকটি বড় কাজ হবে তথ্যগুলো ক্লায়েন্টকে মনে রাখতে সাহায্য করা এবং তিনি যে ইতিবাচক সিদ্ধান্তই নিন না কেন, সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাকে সহায়তা করা।

**কাউন্সেলিং-এর মূলনীতি**

কাউন্সেলিং-এর মূলনীতি হলো, ক্লায়েন্টের সাথে ভালো ব্যবহার ও সম্মান দেখিয়ে তার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। উপযুক্ত তথ্য প্রদান করে পছন্দ অনুযায়ী তথ্য দেওয়া। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সাহায্য করা। কোনো কিছু বুঝতে ও মনে রাখতে না পারলে তাকে সহায়তা করা।

## কাউন্সেলিং-এর সময় যোগাযোগ উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা

### যোগাযোগ উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা

- মনোযোগ আকর্ষণ করতে সাহায্য করে
- আলোচনা শুরু করতে ও প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে
- উপকরণ দিয়ে যে জিনিস চোখে দেখা যায় না তা বোঝানো যায়
- স্পর্শকাতর বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে
- মনে রাখতে সাহায্য করে
- ছাপানো উপকরণ তারা পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের দেখাতে পারে।

মানুষ দেখে ও শুনে শিখতে পছন্দ করে। কাউন্সেলিং-এর সময় শুধু আলোচনা না করে বা পরামর্শ না দিয়ে যোগাযোগ উপকরণ দেখিয়ে বিষয় সম্পর্কে তাদের মনোযোগী করে তুলতে পারা যায়। আনন্দের মাধ্যমে শিখতে পারলে মানুষ তা মনে রাখতে পারে এবং ঘটনা ও বিষয়ের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা খুঁজে পায়। এতে করে ফলপ্রসূ আলোচনা করা সম্ভব হয়। যোগাযোগ উপকরণের সঠিক ব্যবহার করতে পারলে আপনার দেওয়া তথ্যের গুরুত্ব বাড়বে এবং আপনার গ্রহণযোগ্যতাও তৈরি হবে। উপকরণ দেখা ও শিখনের একটি পরিবেশ তৈরি করা যা আলোচনাকে অনেক বেশি অংশগ্রহণমূলক করে। উপকরণ ব্যবহার করার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে, এটি অভিজ্ঞতামূলক শিখনে সহায়তা করে যা অনেক বেশি জীবন ঘনিষ্ট হয় এবং বার্তাগুলো বুঝে, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করে আচরণ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে এবং বার্তাকে নিজের মতো করে ধারণ করতে (আত্মীকরণ) এবং মনে রাখতে সহায়তা করে।

# ২.

# নারী পুরুষের বিয়ে ও বৈবাহিক সম্পর্ক

বিয়ে হলো একটি সামাজিক বন্ধন বা বৈধ চুক্তি যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিভেদে বিয়ের সংজ্ঞার তারতম্য থাকলেও সাধারণভাবে বিয়ে এমন একটি আনুষ্ঠানিক বন্ধন যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও যৌন সম্পর্ক সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। কিছু সংস্কৃতিতে, যেকোনো প্রকারের যৌন কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে বিয়ে সম্পন্ন করাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে পরামর্শ দেওয়া হয় অথবা বিবেচনা করা হয়। বিশদ ভাষায় বলতে গেলে, বিয়ে হলো একটি বৈশ্বিক সর্বজনীন সংস্কৃতি। বিয়ে সাধারণত কোনো রাষ্ট্র, কোনো সংস্থা, কোনো ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী, কোনো স্থানীয় সম্প্রদায় অথবা দলগত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা স্বীকৃত হতে পারে। একে সাধারণত একটি চুক্তি হিসেবে দেখা হয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার হচ্ছে একটি চিরন্তন ও শাশ্বত সংগঠন। আর এই পরিবারই হচ্ছে সমাজের মৌলিক ও আদি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হবে। আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়নে প্রধানতম অন্তরায় হচ্ছে বাল্যবিয়ে। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক আইন ও নারী অধিকার বিষয়ক উদ্যোগের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত বিবাহরীতিগুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ

হিসেবে আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মুসলিম আইন অনুসারে বিয়ে একটি ধর্মীয় দায়িত্বই কেবল নয়, একটি দেওয়ানী চুক্তিও। একজন নারীকে বিয়ে করতে হলে 'দেনমোহর' দেওয়া বাধ্যতামূলক। ইসলাম ধর্মে বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামে বিয়েতে পাত্র-পাত্রী উভয়ের সম্মতি এবং বিয়ের সময় উভয়পক্ষের বৈধ অভিভাবকের উপস্থিতি ও সম্মতির প্রয়োজন। ইসলামে বিয়েতে যৌতুকের কোনো স্থান নেই।

হিন্দুধর্ম মতে বিবাহ চুক্তি নয়, বরং একটি অলঙ্ঘনীয় ধর্মীয় বিধান। একজন হিন্দু পিতার প্রধান কর্তব্য হলো কন্যার বিবাহ দান। শাস্ত্রানুযায়ী পুরুষদের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্যের অন্যতম হলো বিয়ে। হিন্দু আইনের দৃষ্টিতে বিয়ে হলো, ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র মিলন।

বিয়েকে খ্রিষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের উপহার মনে করা হয়। এটি একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে নিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উত্তম ব্যবস্থা এবং যীশু বিবাহ বিচ্ছেদকে খুবই অপছন্দ করতেন।

বৌদ্ধ ধর্মমতে বিয়ে একটি সামাজিক প্রথা। তবে বিয়ের পর ধর্মগুরুর নিকট আশীর্বাদ নেয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার (ইউডিএইচআর)-জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ঘোষণাপত্র-১৬ তে বিয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে:

- প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বিয়ে করা ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। বিয়ে করা এবং বিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে দু'জনেরই সমান অধিকার আছে,
- বিয়ের জন্য দু'জনেরই স্বাধীনভাবে পূর্ণ সম্মতি থাকতে হবে,
- পরিবার সমাজের মৌলিক ইউনিট এবং এটি সমাজ ও রাষ্ট্র দ্বারা সুরক্ষিত।

## বৈবাহিক সম্পর্ক

বিয়ে একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া, অঙ্গীকার, ভালোবাসা, সম্মান, বিশ্বাস, আনুগত্য, প্রতিশ্রুতি, একে অন্যের ধারণা ও বিশ্বাস সম্পর্কে জানা, মুক্ত আলোচনা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, সুস্বাস্থ্য এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা।

- স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসবাস করবে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান, বিশ্বস্ততা, সহায়তা ও সমর্থনের মাধ্যমে সুখী সংসার গড়বে,
- স্বামী ও স্ত্রী দু'জনে পারস্পরিক সম্মতিতে গৃহস্থালীর কাজ করবেন এবং একে অন্যকে সহায়তা করবেন,
- বাংলাদেশে বিয়ের পর সাধারণত মেয়েরা ছেলেদের বাড়িতে যায়। শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পর মেয়েরা ছেলেদের পরিবারের সদস্য হয়ে যায়। যৌথ পরিবারে শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ ও দেবর, ভাসুর বা জা সংসার সুখী হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বিধায় তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টাও খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে,
- শ্বশুর-শাশুড়িকে পিতা-মাতা হিসেবে দেখা এবং ছেলের বৌকেও মেয়ে হিসেবে গণ্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাবা-মাকে যেভাবে দেখা হয়, শ্বশুর-শাশুড়িকে সেইভাবে দেখা, সম্মান করা এবং সময় দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ,
- দম্পতির কেউই তাদের শ্বশুর-শাশুড়ির সমালোচনা করা বা বাবা-মায়ের সাথে শ্বশুর-শাশুড়ির তুলনা না করা,
- স্বামী ও স্ত্রী দু'জন মিলে বয়স, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনা করা,
- নিজের সন্তানদেরকে নিয়ে বাবা-মা যেভাবে সময় কাটাতে চায়, শ্বশুর-শাশুড়িকেও সেই রকম সুযোগ দেওয়া উচিত,
- শ্বশুর বাড়ির লোকদের সাথে কোন সমস্যা হলে সমাধানের জন্য খোলা মন নিয়ে আলোচনা করা উচিত।

## বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা

অন্তরঙ্গতা দু'জন মানুষের বৈবাহিক জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিয়ের আগে ছেলে ও মেয়ের বিয়ে ও বিবাহ পরবর্তী জীবন নিয়ে তাদের দু'জনেরই থাকে নানা প্রত্যাশা ও আকাঙ্খা। এ কারণেই বিয়ের পর স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে আবেগিক অথবা মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সম্পর্কগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মধ্যেই এমন একটা অনুভূতি কাজ করা জরুরি যে, তারা দুজনই সত্যিকার অর্থে পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ রকম হলে, দু'টি ভিন্ন জগতের মানুষ নিজের ভেতরের মানুষটিকে তার সঙ্গীর সামনে পুরোপুরি তুলে ধরতে সংকোচ করবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন সময় কাটানোর সুযোগ থাকতে হবে। নিজের সঙ্গীর কাছে নিজের আশা-আকাঙ্খা তুলে ধরা ও সঙ্গীর আশা-আকাঙ্খা নিজে বুঝতে পারার জন্যই কিছুটা সময় নেওয়া উচিত।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভালবাসা প্রকাশের ভাষাটা বুঝতে হবে। একজনের ভালবাসার ভাষা হয়তো নিজেদের মধ্যে সুন্দর সময় কাটানো, ঘুরে বেড়ানো। আরেকজনের ভালবাসার ভাষা হয়তো একটু ছুঁয়ে দেওয়া, কাছে আসার চেষ্টা করা। তাই একে-অপরের ভালবাসার ভাষাটা বোঝা খুবই জরুরি এবং একে অন্যের ভালবাসার ভাষা প্রকাশের সুযোগ দেওয়াটাও খুব জরুরি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কারও নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলো পরিবারের কারও সাথে আলোচনা করা উচিত নয়, এতে নিজের সঙ্গীর বিশ্বাস ভাঙ্গে। বিশ্বাস ছাড়া কখনই পরস্পর কাছাকাছি আসা সম্ভব নয়।

# ৩.

# নারী ও পুরুষ এবং তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য

প্রজনন স্বাস্থ্য সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রজনন স্বাস্থ্যের ধারণা শুধুমাত্র মাতৃস্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি যেকোনো বয়সের নারী ও পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী - 'প্রজনন স্বাস্থ্য শুধুমাত্র প্রজননতন্ত্রের কাজ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকেই বোঝায় না, এটি শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের অবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ প্রজনন স্বাস্থ্য মূলত সামগ্রিক স্বাস্থ্যেরই একটি অংশ। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে সন্তান জন্মদানের সাথে জড়িত পুরুষ ও নারীর প্রজনন অঙ্গসমূহের সামগ্রিক সুস্থতা এবং এর সাথে মানসিক ও সামাজিক সুস্থতাও জড়িত'।

প্রজনন স্বাস্থ্য আমাদের সামগ্রিক সুস্থতার সঙ্গে জড়িত। কারণ প্রজনন স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে সার্বিকভাবে সুস্থ থাকা যায় না। শৈশব থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হয়। কারণ একটি শিশু যদি ঠিকমতো পুষ্টি না পায় তাহলে তার প্রজনন অঙ্গগুলো ঠিকমতো বেড়ে উঠবে না যা পরবর্তীতে তাকে প্রজনন স্বাস্থ্যের ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেবে।

## প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মনে করা হয় যে, নারীদের বিশেষ যত্ন শুধুমাত্র গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়েই নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই প্রজনন স্বাস্থ্যের বিষয়টি জড়িত। অর্থাৎ, শিশু থেকে বৃদ্ধ বয়সের সকল নারী-পুরুষই প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার আওতায় পড়ে।

- নিরাপদ মাতৃত্ব: গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা এবং নিরাপদ প্রসব সেবাসহ জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম
- পরিবার পরিকল্পনা: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবা ও কাউন্সেলিং
- মা ও শিশুর পুষ্টি
- অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
- প্রজননতন্ত্র সংক্রমণ/যৌনবাহিত রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা
- নবজাতকের পরিচর্যা
- বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসা
- প্রজননতন্ত্রের ক্যান্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসা।

এছাড়া আরও কতগুলো বিষয় দ্বারা প্রজনন স্বাস্থ্য প্রভাবিত হতে পারে। যেমন-যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণ, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জীবন প্রণালী, কৈশোর বয়সের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ইত্যাদি।

## প্রজনন অধিকার

প্রজনন অধিকার বলতে শুধু নারীর নয়, বরং নারী ও পুরুষ উভয়েরেই শরীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেবা পাবার অধিকারকে বোঝায়। প্রজনন অধিকারের মূল দিক হলো সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিরাপদ ও কার্যকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অধিকার। নারীর প্রজনন অধিকার বলতে নারীর সন্তান উৎপাদনের সাথে সরাসরি যুক্ত প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝানো হয়। যেমন: পরিবারে সন্তান সংখ্যা কত হবে সে সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয়ের মিলিত সিদ্ধান্ত, নারী ও পুরুষ উভয়েরেই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি। অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রজনন অধিকার কোনো আইনগত, সাংবিধানিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা কোনো ব্যক্তি কিংবা নাগরিক স্বাধীনতার অধিকার বোঝায় না। প্রজনন অধিকার বলতে শুধু নারীর নয়, বরং নারী ও পুরুষ উভয়েরেই নিজের শরীর ও মন নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বোঝায়। আমাদের দেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ১২টি যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধিকার সামাজিকভাবে স্বীকৃত বলে বিবেচনা করা হয়।

## যৌন ও প্রজনন বিষয়ক ১২টি অধিকার

১. প্রতিটি মানুষের রয়েছে বেঁচে থাকার ও জীবন ধারণের অধিকার। গর্ভজনিত কারণে কোনো নারীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ করা যাবে না
২. প্রত্যেক নারী-পুরুষের স্বাধীন ও নিরাপদ যৌন-জীবন উপভোগ করার ও প্রজনন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রয়েছে। জোর-জবরদস্তি করে গর্ভধারণ, বন্ধ্যাকরণ বা গর্ভপাত করানো যাবে না
৩. যৌন ও প্রজনন জীবনসহ নারী-পুরুষের সমতা এবং সকল প্রকার বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার
৪. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে প্রত্যেক নারী-পুরুষের পছন্দ ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
৫. সমাজ, ধর্ম, বিশ্বাস, দর্শন ও কুসংস্কারের প্রভাবমুক্ত থেকে যৌন ও প্রজনন বিষয়ে মুক্তচিন্তা ও গবেষণার অধিকার
৬. ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাস্থ্যের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে যৌন ও প্রজনন বিষয়ে জানা ও শেখার অধিকার
৭. প্রত্যেক নারী-পুরুষের বিবাহ, বিবাহে পছন্দ ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার
৮. প্রত্যেক দম্পতি কখন, কত ব্যবধানে এবং কয়টি সন্তান গ্রহণ করবেন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার
৯. স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রত্যেকের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্যলাভ, পছন্দসই, নিরাপদ, আরামদায়ক, মর্যাদাপূর্ণ ও নিয়মিত সেবাপ্রাপ্তির অধিকার
১০. চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আবিষ্কৃত সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের অধিকার
১১. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারক/সরকারকে প্রভাবিত করার অধিকার
১২. শিশুদের যৌন নিপীড়ন ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করতে শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং অন্যান্যদের যৌন হয়রানি, ধর্ষণ ও বৈষম্যসহ নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা এবং কু-চিকিৎসা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার।

## প্রজনন অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষের অংশগ্রহণ

- বাল্যবিবাহ রোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৮ বছরের আগে কোন মেয়ের যেন বিয়ে না হয় এবং ২০ বছরের আগে সন্তান ধারণ না করে সে সম্পর্কে নিজে অবগত হওয়া এবং পরিবার ও কমিউনিটিকে এই বিষয়ে সচেতন করা
- বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী একসাথে আলোচনা করে সন্তান ধারণের সময়, সংখ্যা ও দু'সন্তানের মাঝে বিরতির সময় ঠিক করা এবং উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে এবং স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষদের এগিয়ে আসতে হবে
- গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতী মাকে কমপক্ষে ৪ বার নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চেক-আপের জন্য নিয়ে যাওয়া এবং প্রসব পরবর্তী সময়েও ৪ বার সেবার জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চেক-আপের জন্য নিয়ে যাওয়া
- গর্ভকালীন সময়ে গর্ভবতী মা যেন পর্যাপ্ত খাদ্য, পুষ্টি ও বিশ্রাম পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও যত্নের দিকে লক্ষ্য রাখা
- স্ত্রীর গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী বিপদ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- প্রসবকালীন জটিলতা মোকাবিলা করার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা। নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া
- গৃহস্থালী কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা
- নবজাতক এবং মাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা
- যৌনরোগের লক্ষণ দেখা গেলে দু'জনই দ্রুত চিকিৎসা নেয়া
- সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই ভূমিকা আছে তবে সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ভর করে পুরুষের বীর্যে যে শুক্রাণু আছে তার ওপর এই তথ্যটি জেনে রাখা।

# ৪.

# যৌনতা এবং যৌন সম্পর্ক

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ছেলেরা ও মেয়েরা তাদের নিজের সংসার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যৌথ জীবনে প্রবেশের পূর্বে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবাইকে প্রজননতন্ত্র, যৌনতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও সন্তান নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ পৃথিবীতে আসে। ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে ওঠার পাশাপাশি মানুষ তার নিজস্ব জীবন দক্ষতার ভিত্তিতে অন্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি ও মূল্যবোধ তৈরি হয়।

দাম্পত্য জীবন সুখী হওয়ার পেছনে অনেকগুলো বিষয় জড়িত। দু'জনের ভালবাসা এবং মমতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক। এই কারণে বিয়ের আগে হবু দম্পতিদের প্রত্যেককে একে অন্যের প্রজনন অঙ্গ এবং তাদের কাজ, কীভাবে সুস্থ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, যৌনতা এবং সেই সাথে যৌনস্বাস্থ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যৌনতা কেবল যৌন মিলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি জন্ম থেকেই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জীবন-যাপনের সাথে জড়িত যা বয়সের সাথে এবং একেক সমাজে একেক রকমভাবে পরিবর্তিত হয়। যৌন সম্পর্ক এবং যৌন সন্তুষ্টি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যের সম্পর্ককে শক্তিশালী করে। যৌন সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক সময় সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এ বিষয়ে অনেকে বিভ্রান্তিতে ভোগেন। এই কারণে প্রত্যেকের প্রজনন অঙ্গগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

## যৌনস্বাস্থ্য ও যৌনতা

জৈবিকভাবে, যৌনতা বলতে প্রজনন প্রক্রিয়া এবং সেইসাথে ছেলে-মেয়ের যৌন সম্পর্ক এবং সন্তান জন্ম দেয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বোঝায়। কিন্তু যৌনতার সাথে মানসিক ও শারীরিক দিকগুলোও জড়িত যা মূলত মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে বোঝায় যেখানে মানুষের আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশের সাথেও সম্পর্কিত। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যৌনতা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, এবং আইনের সাথে সম্পর্কিত এবং মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিবেচনা করলে এটি নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সাথে জড়িত।

### যৌনস্বাস্থ্য

যৌনস্বাস্থ্য ব্যক্তির শারীরিক, আবেগিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার সাথে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়, যা তাকে পারস্পরিক আনন্দ এবং সংযমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে যৌন ও প্রজনন আচরণকে সংযত করে এবং তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ভালবাসার প্রকাশ এবং আনন্দ বা তৃপ্তি পেতে সাহায্য করে।-'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'

### যৌনতা

যৌনতা হল সারা জীবনব্যাপী একটি বিষয় যা সেক্স, জেন্ডার, সমাজের নারী ও পুরুষের পরিচিতি ও ভূমিকা, যৌন বিষয়ে ধারণা, প্রেম, আনন্দ, সখ্যতা এবং প্রজননকে ঘিরে আবর্তিত। যৌনতার অভিজ্ঞতা অর্জন মানুষের চিন্তা চেতনায়, কল্পনা, বিশ্বাস, মনোভাব, মূল্যবোধ, আচরণ, অনুশীলন, অংশগ্রহণ এবং সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যদিও ঐ সকল বিষয় বা দিকসমূহ যৌনতার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে তবে এর সবগুলোই সব সময় প্রয়োগ এবং প্রকাশ নাও হতে পারে। যৌনতা মানুষের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং আত্মিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। -'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'

‘প্রজনন স্বাস্থ্য কেবলমাত্র প্রজননতন্ত্রের রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকেই বোঝায় না বরং শারীরিক, মানসিক, সামাজিক কল্যাণে পরিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি মাধ্যম’।-‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’

## প্রজনন স্বাস্থ্য

### প্রজনন

প্রজনন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দম্পতি তাদের সন্তান জন্মদান করে। প্রজননতন্ত্রের মাধ্যমে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। স্ত্রী এবং পুরুষ প্রজননতন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ প্রজননতন্ত্রের গঠন ও কাজ সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

### প্রজনন পদ্ধতি

দুই ধরনের জননকোষ (Sex cell/Gamete) প্রজনন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে। পুরুষ জননকোষকে শুক্রাণু (Sperm) ও স্ত্রী জননকোষকে ডিম্বাণু (Ovum) বলা হয়। যখন শুক্রাণু ও ডিম্বাণু একসঙ্গে মিলিত হয় তখন তাকে নিষিক্তকরণ (Fertilization) বলে। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটি ডিম্বনালিতে (Fallopian tube) সম্পন্ন হয়। নিষিক্তকরণের পর ভ্রূণকোষ (Zygote) তৈরি হয়। এই ভ্রূণকোষ ডিম্বনালির মধ্যে দিয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করে জরায়ুর দেয়ালে (Endometrium) গ্রথিত (Implantation) হয়। যেখান থেকে ধাপে ধাপে ভ্রূণ (Embryo), তারপর ফিটাস (Fetus) তৈরি হয়।

### স্ত্রী ও পুরুষ প্রজননতন্ত্র

পুরুষ দেহের যেসকল অঙ্গ প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদেরকে পুরুষ প্রজননতন্ত্র বলে।
নারী দেহের যেসকল অঙ্গ প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদেরকে স্ত্রী প্রজননতন্ত্র বলে।
নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর সাথে আমাদের আচরণ ও কাজ নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

## স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের কাজ

বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty) -এর আগে মেয়েদের ২টি ডিম্বাশয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। বয়ঃসিন্ধকালে ডিম্বাশয় সক্রিয় হয়ে ইস্ট্রোজেন নিঃসরণ করে, ফলে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় ও মাসিক শুরু হয়। প্রতি মাসে সাধারণত ১টি ডিম্বানু পরিপক্কতা লাভ করে।

## মাসিক চক্র (Menstrual cycle)

একটি নির্দিষ্ট নিয়মে জরায়ুর অভ্যন্তরে স্তরটি প্রতি মাসে ঝরে পড়াকে মাসিক বলে। সাধারণত মাসিক ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়সে শুরু হয় এবং ৪৫ থেকে ৫২ বৎসর বয়সে বন্ধ হয়ে যায়। এক মাসিকের শুরুর দিন থেকে পরের মাসিকের শুরু পর্যন্ত সময়কে মাসিক চক্র বলে। স্বাভাবিক মাসিক চক্র ২১-৩৫ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বেশির ভাগ নারীর মাসিক ২৮ দিন বা এক মাস পরপর হয়ে থাকে। অর্থাৎ ২৮ দিনে একটি মাসিক চক্র হয়। প্রতি মাসে যখন মাসিক হয় সেসময় (মাসিক চক্রের প্রথম ৫ দিন) জরায়ুর অভ্যন্তরের স্তর ভাঙ্গতে থাকে। ঠিক এই সময় হরমোনের প্রভাবে ডিম্বাশয়ের কয়েকটি ছোট ডিম্বাণু বড় হতে শুরু করে। এর মধ্যে একটি খুব দ্রুত বাড়তে শুরু করে এবং পরিপক্ক ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। এই ডিম্বাণু সাধারণত মাসিক চক্রের ১৪তম দিনে

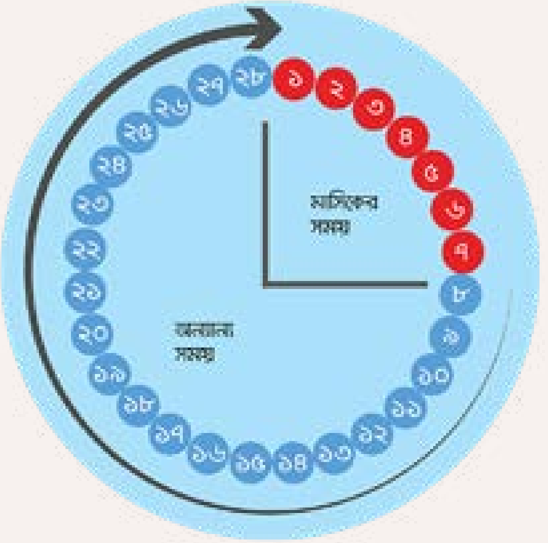

ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে আসে, একে ডিম্বস্ফোটন বলে। ডিম্বস্ফোটনে হরমোনের বিশেষ ভুমিকা রয়েছে। ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে জরায়ুতে অবস্থান করলে গর্ভধারণ হয় এবং মাসিক বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি ডিম্বাণু নিষিক্ত না হয় অথবা জরায়ুতে অবস্থান না নেয় হয় তবে জরায়ুর অভ্যন্তরের স্তরটি যথারীতি ভাঙ্গতে শুরু করে যা মাসিক হয়ে ঝরতে থাকে।

## মাসিক চক্র (Menstrual cycle)

- দিন-১ মাসিক চক্রের শুরু
- দিন-৫ সাধারণত মাসিকের শেষ দিন
- দিন-১৪ ডিম্বাণু পরিপক্ক হয় এবং ডিম্বাশয় থেকে ফেটে বের হয়ে আসে। ২০ ঘন্টা পর্যন্ত ডিম্বাণু জীবিত থাকে। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হলে গর্ভধারণ হয়
- দিন-২২ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত না হলে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন কমে যায় এবং জরায়ু পরবর্তী মাসিক চক্রের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে
- দিন-২৮ সাধারণত মাসিক চক্রের শেষ দিন।

**মাসিকের সময়কাল** (Menstrual period)

যে কয়েকদিন রক্তস্রাব হতে থাকে তাকে মাসিকের সময়কাল বলে। স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিমাসে ৩-৭ দিন রক্তস্রাব হয়। বেশিরভাগ নারীর সাধারণত ৫ দিন রক্তস্রাব হয়ে থাকে। যদি ৮ দিনের বেশি রক্ত যায়, তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

কখনো কখনো মাসিক অনিয়মিত হতে পারে। যেমন:

- প্রথম মাসিক শুরু হওয়ার দুই বছর পর্যন্ত মাসিক অনিয়মিত থাকতে পারে
- আনন্দ, চরম হতাশা, ভয় বা মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে থাকলে
- জলবায়ু ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে
- খাবার বড়ি এবং জন্মবিরতিকরণ ইনজেকশনের কারণে
- শারীরিক অসুস্থতার কারণেও মাসিক চক্র অনিয়মিত হতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

গর্ভকালীন সময়ে, বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় এবং যারা খাবার বড়ি, ইনজেকশন এবং ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করেন তাদের মাসিক সাময়িক বন্ধ থাকতে পারে।

**মাসিক স্রাবের পরিমাণ ও রং**

স্বাভাবিক মাসিকের সময়ে স্বাভাবিক রক্তপাতের পরিমাণ প্রায় ৭০-৮০ মি. লি.। স্বাভাবিক মাসিকের সময়ে দিনে ৫/৬ বার স্যানিটারি প্যাড/কাপড় পাল্টাতে হয়। একেক নারীর ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব একেক রকম হতে পারে। কারো স্রাব অল্পসময় যেমন: ২ দিন হতে পারে, আবার কারো ৭ দিন পর্যন্ত চলতে পারে। ঋতুস্রাব বেশি বা কম হতে পারে। স্বাভাবিক ঋতুস্রাবের রঙ নানা রকমের হতে পারে। যেমন: টাটকা লাল, কালচে, বাদামি, পানির মত, দানাদার বা ছোট ছোট জমাটবাধাঁ রক্তের আকারে।

**স্বাভাবিক মাসিকের ব্যবস্থাপনা**

মাসিকের রক্ত ধারণ করার জন্য যে কাপড়/প্যাড ব্যবহার করা হয় তা অবশ্যই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে ব্যাকটেরিয়া সহজেই যোনিপথ, জরায়ু এমনকি তলপেটে সংক্রমণ করতে পারে। যদি কাপড় ব্যবহার করা হয় তবে কাপড় সাবান এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। ফেলে দেয়া যায় এমন প্যাড/তুলা ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা নিরাপদভাবে ফেলতে হবে বা পুঁতে ফেলতে হবে। মাসিকের সময় সহবাসে কোনো স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা নেই। তবে বেশিরভাগ দম্পতিরা এই সময় সহবাস এড়িয়ে চলেন। এতে করে যৌনরোগ ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের চেয়ে মাসিক চলাকালীন সময়ে প্রজনন অঙ্গের পরিচ্ছন্নতা অনেক বেশি দরকার। মাসিক চলাকালীন সময়ে অবশ্যই প্রতিদিন গোসল করতে হবে এবং পরিষ্কার থাকতে হবে। অপরিষ্কার থাকলে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হতে পারে এবং প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে। গোসলের পর প্রজনন অঙ্গ শুকনো রাখতে হবে।

মাসিকের এক সপ্তাহ আগে স্তন ভারি ভারি লাগতে পারে, মাথা ব্যথা থাকতে পারে এবং পিঠের ব্যথা থাকতে পারে, হতাশা থাকতে পারে বা অল্পতেই রেগে যেতে পারে। মাসিক চলাকালীন সময়, অনেক নারীর তলপেটে ব্যথা করতে পারে, কোমরে, হাঁটুতে, পায়ে ও পিঠে ব্যথা করতে পারে। এই সময় বমি বমি ভাব থাকতে পারে, খুব ক্লান্ত লাগতে পারে। এই উপসর্গগুলো হয়ে থাকে মূলত হরমোনের নিঃসরণ এবং জরায়ুর সংকোচনের কারণে। এগুলোকে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা না করে স্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তন হিসেবে দেখতে হবে এবং প্রতিদিনের কাজ আগের মতো চালিয়ে যেতে হবে। তবে ব্যথা বেশি হলে এ সময় ব্যথানাশক ঔষধ খেতে পারেন।

# ৫.

# যৌনবাহিত সংক্রমণ

যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে যেসকল সংক্রমণ ছড়ায় সেগুলোই যৌনবাহিত সংক্রমণ। কিছু কিছু যৌনবাহিত সংক্রমণ জীবাণুযুক্ত রক্ত ব্যবহারের ফলে কিংবা রোগাক্রান্ত মা থেকে তার গর্ভের শিশুর মধ্যেও ছড়াতে পারে। যৌনবাহিত সংক্রমণের প্রভাব বিশ্বের বহু পুরুষ, নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং সমাজ ও অর্থনীতির উপর পড়েছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমণের হার এবং প্রকোপ বেড়েই চলেছে। যৌনবাহিত সংক্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। কারণ আক্রান্ত ব্যক্তির উপর যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহের বেশ বড় ধরণের মানসিক, সামাজিক ও চিকিৎসাজনিত প্রভাব পড়ে থাকে। আর আক্রান্ত নারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝুঁকি হিসেবে তার গর্ভজাত শিশুতে এই রোগ ছড়ানোর আশংকা থেকেই যায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যৌনবাহিত সংক্রমণ সাধারণত যৌনমিলনের মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়ায়। তাছাড়া যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহের যেগুলোতে যৌনাঙ্গে ঘাঁ থাকে সেগুলো যৌনসঙ্গীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের আশংকাকে বাড়িয়ে দেয়। যৌনবাহিত সংক্রমণের মধ্যে ক্ল্যামাইডিয়া, গনোরিয়া, সিফিলিস এবং ট্রাইকোমোনিয়াসিস- এই চার ধরণের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

আমাদের দেশে যৌনবাহিত সংক্রমণসমূহের প্রকোপের উচ্চহার সত্যিকার অর্থেই স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ অনেক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীই যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে অস্বস্তি বোধ করেন। যেহেতু দিন দিন সমস্যাটি বেড়েই চলেছে, সেহেতু এখন থেকেই সবসময় এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।

যৌনবাহিত রোগ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বেশির ভাগ যৌনবাহিত রোগেরই প্রথমদিকে কোন উপসর্গ দেখা যায় না ফলে চিকিৎসা  ব্যবস্থা গ্রহণে দেরি হয়ে যায়। অনেক সময় স্বাস্থ্যসচেতন লোকদেরও সংক্রমণ সর্ম্পকে সচেতনতার অভাবে এ রোগ হতে পারে। তাই যৌনবাহিত রোগের সংক্রমণ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই সচেতন হওয়া দরকার।

## যৌনবাহিত সংক্রমণ

যৌনমিলনের মাধ্যমে প্রজনন অঙ্গে যে সব সংক্রমণ বা রোগ হয় তাকে যৌনবাহিত সংক্রমণ বা রোগ বলে। যেমন: সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস, হারপিস ইত্যাদি। ত্রিশের অধিক ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং প্যারাসাইটের কারণে যৌনবাহিত রোগ হয়। এইসব জীবাণুগুলো গনোরিয়া, সিফিলিস, আর্থ্রাইটিস, জরায়ু মুখের (Cervitis) সংক্রমণ, তলপেটের প্রজনন অঙ্গের প্রদাহজনিত রোগ (Pelvic Inflammatory disease), মলদ্বার এবং পায়ুপথে ব্যথা, ডায়রিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ ছড়ায়।

### মানুষের শরীরে যৌনবাহিত সংক্রমণ যেভাবে ছড়ায়

- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যেকোনো ধরণের যৌনমিলন
- আক্রান্ত মা হতে গর্ভকালীন সময়ে, প্রসবকালীন সময়ে বা বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে সন্তানের মাঝে
- জীবাণুযুক্ত সুঁচ-সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে
- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে।

### যৌনবাহিত সংক্রমণের ফলে জটিলতা

- নারী ও পুরুষ উভয়ের সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে
- অসময়ে প্রসব বা গর্ভপাত হতে পারে
- ডিম্বনালিতে গর্ভধারণ হতে পারে যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ
- আক্রান্ত গর্ভবতী মা মৃত সন্তান প্রসব করতে পারেন
- আক্রান্ত মায়ের নবজাতক শিশুর জন্মগত ত্রুটি ও অন্ধত্ব হতে পারে
- নারীদের জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হতে পারে
- চোখের প্রদাহ
- এইচআইভি ভাইরাস বা এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলে শরীরে একের পর এক নানাবিধ রোগের সংক্রমণ ঘটে যার পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু
- যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হলে রোগীকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়
- স্বামী বা স্ত্রীর যে কেউ যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হলে অপরজনের মধ্যে তা বিস্তারের সম্ভাবনা শতভাগ।

### যৌনবাহিত সংক্রমণ হয়েছে তা কি করে বুঝবেন

- শরীরের যেকোনো স্থানে ব্যথা বা ফোলা
- মুখে অথবা যোনিপথে অথবা পায়ুপথে ব্যথাযুক্ত বা ব্যথাহীন ফোড়া
- প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া করা
- পুরুষদের যৌনাঙ্গ থেকে কিছু নিঃসৃত হওয়া। অণ্ডকোষ লালচে ও ফুলে ওঠা এবং ব্যথা অনুভূত হওয়া
- মেয়েদের যোনিপথ থেকে কিছু নিঃসৃত হওয়া
- কুঁচকিতে ব্যথা, বা লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া এবং অনেক সময় জ্বর এবং ফ্লু-এর অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেওয়া
- সংক্রমণের কিছু দিন বা তিনমাস পর এর উপসর্গগুলো দেখা দিতে পারে
- ঠাণ্ডা, অবসাদ অথবা ত্বকে জ্বালাপোড়ার মত উপসর্গ দেখা দেওয়া
- চিকিৎসা ছাড়াই লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যেতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে বার বার লক্ষণ ও জটিলতা দেখা দিতে পারে
- যৌনবাহিত সংক্রমণের ফলে বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।

## যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- শুধুমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গীর সাথে যৌন সম্পর্ক বজায় রাখা
- বিশ্বস্ত সঙ্গী ছাড়া অন্য কারো সাথে প্রতিবার যৌন মিলনের সময় সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করা
- যৌনরোগ থাকলে আপনার ও সঙ্গীর দ্রুত চিকিৎসা করা
- সেবাদানকারীর পরামর্শ অনুযায়ী পুরো মেয়াদের ওষুধ সেবন করা
- মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও জীবাণুমুক্ত প্যাড বা ন্যাপকিন ব্যবহার করা
- প্রসবের সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর সাহায্য নেয়া
- প্রাথমিক অবস্থায় এসব রোগের লক্ষণ দেখা নাও যেতে পারে, তাই কোনো সন্দেহ হলেই সেবাদানকারীর পরামর্শ নেওয়া
- একবার ব্যবহার করা যায় এমন জীবাণুমুক্ত সূঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করা
- জীবাণুমুক্ত রক্ত গ্রহণ করা
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা।

**কখন ডাক্তার দেখাবেন**

- শারীরিক সঙ্গীর যৌনবাহিত (এসটিডি)/যৌনরোগ থাকলে
- যদি মনে হয় যে যৌনবাহিত (এসটিডি) রোগ হয়েছে
- যোনিপথে ফোড়া বা লালচে দানা হলে
- পুরুষের যৌনাঙ্গ এবং মেয়েদের যোনিপথ দিয়ে কিছু নির্গত হলে
- প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া হলে
- কুঁচকির লসিকানালি ফুলে গেলে।

## কাদের যৌনবাহিত সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেশি

- যারা অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন
- যারা অল্প বয়স থেকে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হন
- যাদের সাম্প্রতিক সময়ে কোনো যৌনবাহিত রোগ হয়েছে তাদের সংস্পর্শে এলে
- যাদের একবার যৌনবাহিত কোনো রোগ হয়েছে
- যারা একের অধিক ব্যক্তির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন
- যারা সূঁচের মাধ্যমে শিরা পথে মাদক গ্রহণ করেন
- যারা মাদক সেবন করেন।

## প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং প্রতিরোধ ও প্রতিকার

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ বলতে প্রজননতন্ত্রের সব ধরণের সংক্রমণকে বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে যৌনবাহিত রোগ এবং প্রজননতন্ত্রের অন্যান্য সংক্রমণ।

**প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের কারণসমূহ**

- মাসিকের সময় অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখা
- জীবাণুমুক্ত পরিবেশে প্রসব না হলে এবং গর্ভপাত করানোর সময় যদি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণ না হয়
- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে যৌন মিলন না করলে
- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে গ্রহণ করলে
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে কনডম ছাড়া যৌন মিলন করলে
- আক্রান্ত গর্ভবতী মা থেকে সন্তানের মাঝে।

## এইচআইভি

এইচআইভি বা হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস হচ্ছে এক ধরণের ভাইরাস যা মানুষের শরীরে প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আক্রান্ত করে, দূর্বল করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এই ভাইরাসের কারণে এইডস হয়। এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করার পর থেকে এইডস হিসেবে প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। তবে একবার এইচআইভি শরীরে প্রবেশ করলে কোনো না কোনো সময় এইডস দেখা দেবেই। এইচআইভি ছোঁয়াচে না তবে যৌনবাহিত রোগের মতো এইচআইভি ভাইরাস একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়।

## এইডস

এইডস হলো একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এটি এইচআইভি সংক্রমণের শেষ ধাপ। এইডস হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় ফলে শরীর নানা প্রকার সুযোগসন্ধানী সংক্রমণ, যেমন- নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়। । এইডস-এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু।

## এইচআইভি ও এইডস-এ আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ

**সাধারণ লক্ষণ:**

- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা কাশি
- সারা দেহে চুলকানিজনিত চর্মরোগ
- বার বার সারা দেহে 'হারপিস জস্টার' (বিশেষ ধরণের চর্মরোগ)-এর সংক্রমণ
- মুখ ও গলায় ফেনাযুক্ত এক ধরণের ঘা/ছত্রাক ঘা (আঠালো)
- লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া
- স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া
- ক্লান্তি ও ক্ষুধাহীনতা দেখা দেয়া।

মারাত্মক লক্ষণ:

- শরীরের ওজন শতকরা ১০ ভাগের বেশি কমে যাওয়া
- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা বা থেমে থেমে পাতলা পায়খানা হওয়া
- এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা জ্বর অথবা জ্বর জ্বর ভাব থাকা।

## মানুষের শরীরে এইচআইভি যেভাবে ছড়ায় এবং যেভাবে ছড়ায় না

### যেভাবে এইচআইভি ছড়ায়

- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যেকোনো ধরণের যৌনমিলনের মাধ্যমে রক্ত, বীর্য বা যোনীরসের মাধ্যমে
- এইচআইভি ভাইরাস আছে এমন কোনো ব্যক্তির রক্ত অন্য কারো শরীরে সঞ্চালন করা হলে
- আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁচ, সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কারো শরীরে ব্যবহার করলে
- শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে এমন যন্ত্রপাতি যেমনঃ স্কালপেল, সুঁই, রেজার ব্লেড, ট্যাটু করার সুঁই, খৎনা করার যন্ত্রপাতি সংক্রমিত অবস্থায় ব্যবহার করলে
- আক্রান্ত মা হতে গর্ভকালীন সময়ে, প্রসবকালীন সময়ে বা বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে সন্তানের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে।

### যেভাবে এইচআইভি ছড়ায় না

- আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত গ্লাসে পানি পান করলে
- এইচআইভি ও এইডস সংক্রমিত লোকের ব্যবহৃত পুকুর বা পুলে গোসল করলে বা সাতার কাটলে
- মশা বা অন্যান্য রক্তচোষা পোকামাকড়ের কামড় খেলে যা কিনা আগে সংক্রমিত মানুষকে কামড় দিয়েছে বা রক্ত খেয়েছে
- এইচআইভি ও এইডস রোগীর সাথে সামাজিকভাবে বসবাস করলে
- একই বাথরুম ব্যবহার করলে
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে হাত মেলালে
- আক্রান্ত ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরলে বা সামাজিক চুম্বন করলে
- হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে
- একই খাবার খেলে বা কাপড়-চোপড় ও বাসনপত্র ব্যবহার করলে
- আক্রান্ত ব্যক্তির লালা, চোখের জল বা ঘামের মাধ্যমে
- একই সাথে খেলাধুলা বা একই স্কুলে পড়াশোনা করলে

## ৬.

# যুব বয়সের প্রয়োজনীয় পুষ্টি

বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে বৈচিত্রপূর্ণ খাদ্যের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে এখনো আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারিনি। যুবক-যুবতীসহ সব বয়সী মানুষের পুষ্টি একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের হার এখনো অপ্রতুল। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বর্তমানে ২ রকমের অপুষ্টির শিকার। খাদ্যের অভাবজনিত পুষ্টিহীনতা এবং খাদ্য সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক রোগ। খাদ্যের অভাবজনিত উল্লেখযোগ্য পুষ্টিহীনতার মধ্যে রয়েছে খর্বকায়, নিম্ন ওজন এবং কৃশকায়। খাদ্য সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি অসংক্রামক রোগগুলো হলো স্থূলতা, উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যান্সার ও বেশি বয়সে হাড়ের ক্ষয় ও ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পাওয়া।

অপুষ্টি আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা যার প্রধান শিকার কিশোর-কিশোরী, মা ও শিশু। পুষ্টিহীনতার জন্য শুধুমাত্র দারিদ্র্য বা অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণই যে একমাত্র কারণ তা নয় বরং প্রাপ্ত খাবারের সঠিক ব্যবহার ও সাধারণ পুষ্টিজ্ঞানের অভাব, খাদ্যাভ্যাস, কুসংস্কার এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস পালন না করা অনেক ক্ষেত্রেই দায়ী।

বিডিএইচএস ২০১৪ -এর তথ্যমতে বাংলাদেশে প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ১ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার ৩৮ জন, মারাত্মক খর্বতা শতকরা ১৫, মধ্যম থেকে মারাত্মক খর্বতা শতকরা ৩৬, মারাত্মক কৃশকায় শতকরা ৪, মধ্যম থেকে মারাত্মক কৃশকায় শতকরা ১৪। মারাত্মক স্বল্প ওজন (আন্ডারওয়েট) শতকরা ১০ এবং মধ্যম থেকে মারাত্মক স্বল্প ওজন শতকরা ৩৩ ভাগ শিশু। আবার ন্যাশনাল লো বার্থ ওয়েট সার্ভে ২০১৫ মতে বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ২৭টি শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সবগুলো সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে কিশোরী, মা ও শিশুর অপুষ্টি।

২০২৫ সালের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অপুষ্টি হ্রাস করতে 'জাতীয় পুষ্টিনীতি ২০১৫' ও অন্যান্য নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনায় (২০১৬-২০২৫) কয়েকটি সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- শিশুর জন্মের প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যে মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার ৮০%-এ উন্নীত করা, ৬ মাসের কমবয়সী শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর হার বাড়িয়ে ৭০%-এ উন্নীত করা, ২০ থেকে ২৩ মাস বয়সী শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো অব্যাহত রাখার হার ৯৫% করা, ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুদের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য খাবার গ্রহণের হার বাড়িয়ে ৪০% এর বেশি করা, কম জন্ম ওজনের হার কমিয়ে ১৬% করা, ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের খর্বাকৃতির হার কমিয়ে ২৫% করা, ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে কৃশকায়তার হার কমিয়ে ৮% করা, ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের হার কমিয়ে ১৫% করা, ৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টির হার কমিয়ে ১%-এর নিচে আনা।

## খাদ্য

খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা বজায় থাকে, ক্ষয়পূরণ ও বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয় এবং সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। খাদ্যের কাজ হলো শরীরে তাপশক্তি ও কর্মক্ষমতা যোগানো,শরীর গঠন ও বৃদ্ধিসাধন এবং ক্ষয়পূরণ, শরীর রোগমুক্ত রাখা, অসুস্থ শরীরকে আরোগ্যলাভে সহায়তা করা।

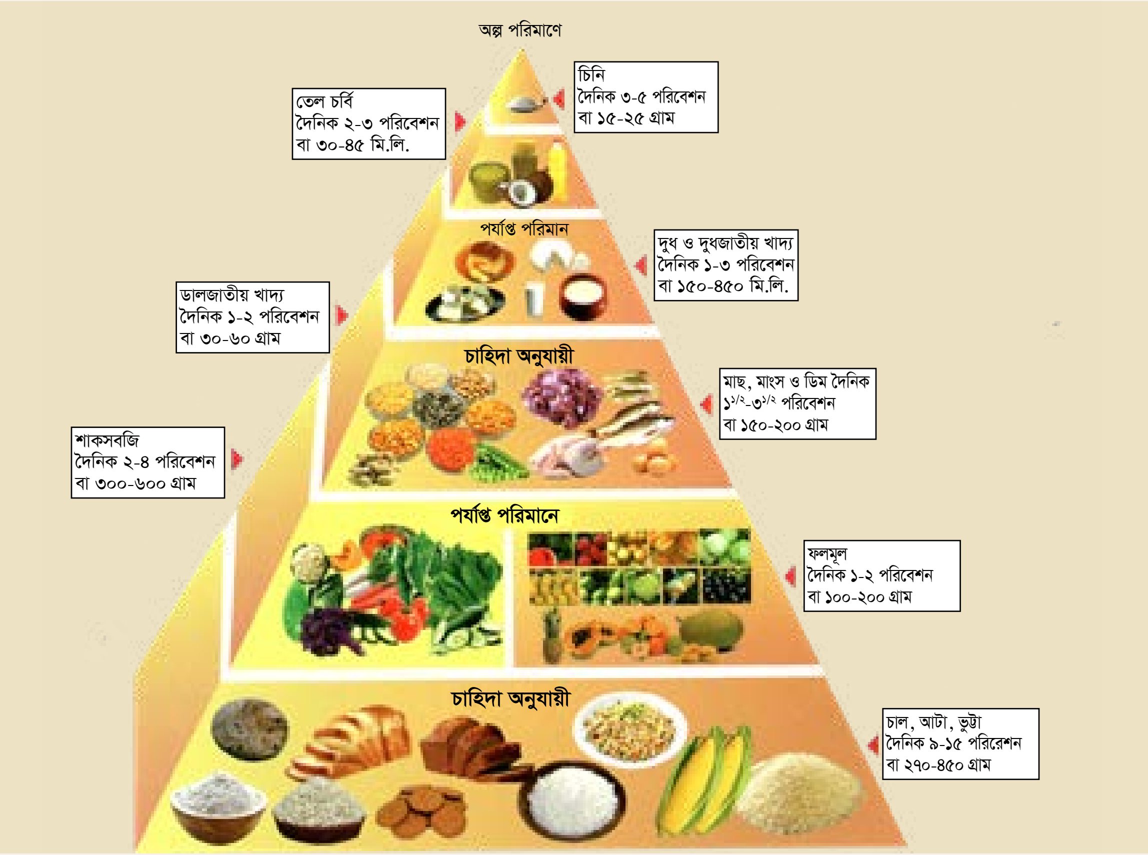

## পুষ্টি

পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণ করা খাদ্য, শোষিত হয়ে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে, শরীরের বৃদ্ধি সাধন করে, শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে।

খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে জড়িত। যেকোনো খাদ্য গ্রহণ করলেই হবে না, তা অবশ্যই হতে হবে পুষ্টিসম্মত এবং নিরাপদ। পুষ্টিসম্মত খাদ্য গ্রহণ না করলে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ ঘটে। পুষ্টিসম্মত খাবার গ্রহণ করলে শরীর ও মন উভয়ই ভালো থাকে।

## সুষম খাদ্যের উপাদান ও উৎস

| খাদ্যের উপাদান | উৎস | কাজ |
|---|---|---|
| শ্বেতসার বা শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) | ভাত, রুটি, আলু, মুড়ি, চিড়া, খৈ, চিনি, মধু ইত্যাদি | প্রধানত শক্তি উৎপাদনকারী |
| তেল ও চর্বি | তেল, মাছ-মাংসের চর্বি, মাখন, ঘি | শরীরে শক্তি উৎপাদন করে, তবে এর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা শর্করার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি |
| আমিষ (প্রোটিন) | মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, বিভিন্ন ধরনের ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি | দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন |
| ভিটামিন | দুধ, ডিম, কলিজা, সব ধরনের শাক-সব্জি, ফল ইত্যাদি | দেহ সুস্থ রাখে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় |
| খনিজ উপাদান | মাছ, মাংস, কলিজা, দুধ, ডিম, গাঢ় সবুজ শাক-সব্জি, লবণ ইত্যাদি | দেহের গঠন ও ক্ষয়পূরণে ভূমিকা রাখা |
| মিনারেল | পানি | বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি দেহের গঠন ও বিভিন্ন কাজে সমন্বয় সাধন করে |

## অপুষ্টি

অপুষ্টি এমন একটি শারীরিক অবস্থাকে বোঝায় যা প্রধানত শরীরে প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণযুক্ত খাবার কম পরিমাণে খাওয়ার ফলে ঘটে থাকে। খাদ্যে এক বা একাধিক বিশেষ করে আমিষ উপাদানের স্বল্পতা অর্থাৎ সুষম খাদ্যের দীর্ঘ অভাবই অপুষ্টির অন্যতম কারণ।

## সুষম খাদ্য

সুষম খাদ্য হচ্ছে সেই খাদ্য যাতে খাদ্যের সব পুষ্টি উপাদান দেহের প্রয়োজনমত বয়স, পেশা ও লিঙ্গভেদে সঠিক মাত্রায় থাকে। অর্থাৎ সুষম খাদ্য হলো এমন একটি খাবার যাতে শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধিকারক ও রোগ-প্রতিরোধ উপাদান পরিমাণমত রয়েছে। প্রত্যেকের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে যে সে কী ধরনের সুষম খাবার খেতে পারে। বেশি খরচ করে যেমন সুষম খাবার খাওয়া যায়, তেমনি অল্প খরচেও সুষম খাবার খাওয়া যায়।

## অপুষ্টি প্রতিরোধে করণীয়

- প্রক্রিয়াজাত খাবার বা ফাস্টফুড যেমন: জুস, ড্রিংকস্, এনার্জি ড্রিংকস্, পিৎজা, বার্গার, সিংগারা, চানাচুর, চিপস ইত্যাদি কম খেতে হবে বা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এগুলো উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার যা হতে অসংক্রমণ রোগ (NCD) যেমন: হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং ওজন আধিক্য হওয়ার আশংকা অনেক বেশী
- সুষম খাবার খাওয়া (মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম, দুধ, ঘন ডাল, সবুজ ও রঙিন শাক-সবজি এবং ফল খেতে হবে)
- নিয়মিত খেলাধুলা বা শরীর চর্চা করতে হবে
- ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন ফলিক এসিড (IFA) ট্যাবলেট খাওয়া
- প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ৬ মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক বড়ি গ্রহণ করা
- খাবার খাওয়ার আগে ও পরে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা এবং জুতা বা স্যান্ডেল পায়ে পায়খানায় যাওয়া
- মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, এ সময় সব ধরণের খাবার খাওয়া যায় এবং সব স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায়
- ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দেওয়া। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা এবং বাল্যবিবাহকে নিরুৎসাহিত করা
- নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং কাজের পরিবেশ নিরাপদ রাখা, ২০ বছরের আগে গর্ভধারণ না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা
- কিশোরীকে টিটেনাস টিকার ৫টি ডোজ সম্পূর্ণ করানো
- আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করা।

৭.

# পরিকল্পিত এবং সঠিক সময়ে সন্তান নেয়ার সুবিধা

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েদের যে কথাটি শুনতে হয় সেটি হচ্ছে, সন্তান নিচ্ছেন কবে? বিয়ের মাধ্যমে নারীর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে প্রবেশ ঘটে। নতুন এই পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর আগেই যেন তাকে নতুন আরেক পরিবেশে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রতিটি নারীর জীবনে বিয়ের চেয়েও সন্তান নেওয়ার মধ্য দিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সন্তান নেওয়ার আগে প্রত্যেক নারীর শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন। অল্প বয়সে সন্তান নিতে গিয়ে অনেক নারীকেই অকালে প্রাণ হারাতে হয়। আবার অনেক সময় নিজেদের ক্যারিয়ার ও সাংসারিক ঝামেলার চিন্তা থেকে বাচ্চা নিতে বেশি দেরি করলে তা সন্তান না হওয়ার পেছনে কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অন্যতম সমস্যা হলো অল্প বয়সে বিয়ে ও সন্তান ধারণ। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড হেলথ সার্ভের (বিডিএইচএস) রিপোর্টে দেখা গেছে, ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে শতকরা ৩১ ভাগ সন্তান জন্ম দিয়েছে বা গর্ভাবস্থায় আছে (শতকরা ২৫ ভাগ মা হয়েছে ও ৬ ভাগ গর্ভবতী)। আবার যেসকল কিশোরী মাধ্যমিক বা তার উপরে শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাদের শতকরা ১৮ ভাগ সন্তান ধারণ করেছে। অপরদিকে যারা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের শতকরা ৪৮ ভাগ সন্তান ধারণ করেছে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত কিশোরীদের শতকরা ৩২ ভাগ সন্তান ধারণ শুরু করেছে যা শহরে বসবাসরত কিশোরীদের তুলনায় বেশি (শতকরা ২৭ ভাগ)। পরিবার পরিকল্পনার

সাথে সম্পৃক্ত যে মানবাধিকার, বাল্যবিবাহের শিকার কিশোরীরা তা থেকে কোনো না কোনোভাবে বঞ্চিত, কিশোরী মায়েদের নিয়ে যে পরিকল্পনা সেখানে তার নিজেরই অংশগ্রহণ প্রায় নেই আর থাকলেও তা খুব সীমিত।

বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার অন্যান্য অনেক দেশের চাইতে বেশী। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার অনেক কমে আসলেও তা এখনো প্রতি ১০০,০০০ জনে প্রায় ১৭০। বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর কারণগুলো হলো, অনিরাপদ গর্ভপাত, গর্ভাবস্থায় অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা, সংক্রমণ এবং ঘনঘন গর্ভবতী হওয়া, পারিবারিক নির্যাতন ইত্যাদি। এই কারণগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে গর্ভাবস্থায় অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা, সংক্রমণ এই ব্যাপারগুলো শারীরিকভাবে গর্ভাবস্থার জন্য অপ্রস্তুত থাকার লক্ষণ।

সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। তাই বিয়ের পর সন্তান নেওয়ার আগে পরস্পরকে বোঝার জন্য কমপক্ষে এক বছর সময় নেওয়া প্রয়োজন যা নারীকে সন্তান নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। প্রাপ্ত বয়সে বিয়ে করলে পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় করার সময়টি আরো বেশি পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মতামতের ভিত্তিতে প্রথম সন্তান নেওয়া উচিত। তবে কোনভাবেই মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান নেয়া উচিত নয়।

নববিবাহিত দম্পতির প্রথম সন্তান কবে নেওয়া উচিত এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহের হার এখনো অনেক বেশি। তাই নারীদের ক্ষেত্রে প্রথম যেটা লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো বিয়ে যেন ১৮ বছরের পর এবং সন্তান যেন কখনই ২০ বছরের আগে না হয়। ২০ বছরের আগে নারীর শারীরিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় না। ফলে এর আগে সন্তান নিলে বাচ্চার নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ ও সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় গর্ভপাত হয়ে যায়। বাচ্চার শরীরের গঠন ঠিকমতো হয় না। দুই সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে দুই থেকে তিন বছর পার্থক্য রাখা উচিত, যা মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য দরকার। ৩৫ বছর পেরিয়ে গেলে দেখা যায় সন্তান আর হতে চায় না। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এসব নানা রোগ দেখা যায়, আর বাচ্চা অস্বাভাবিক হওয়ার আশংকাও থাকে।

নিজের শরীর সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় নারীরা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা সন্তান নিতে আগ্রহী থাকেন এবং নারীকে এ ব্যাপারে চাপ দেন। বিয়ের পরপরই একটি মেয়েকে স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোকজন, অনেক ক্ষেত্রে নিজের পরিবার এবং সামাজিক চাপে পড়ে মানসিক ও শারীরিকভাবে তৈরি হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নিতে হয়। কিন্তু যদি নারী সন্তান নিতে আগ্রহ প্রকাশ না করেন বা নারীর সন্তান হতে দেরি হয় কিংবা সন্তানই না হয়, তবে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে নারীকে অনেক অপমানের আর নানান ধরনের কটু মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়।

আমাদের দেশে প্রতিদিন ২০ জন মা গর্ভজনিত কারনে মারা যায় এবং ২০-২৫ জন মা কোনো না কোনো প্রসব-পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী জটিলতায় ভোগেন। সময়মতো যথাযথ সেবা/ব্যবস্থা নিলে যার বেশীরভাগই প্রতিরোধ করা সম্ভব। বাল্যবিবাহ রোধ ও উপযুক্ত বয়সে সন্তান নিলে এ সংখ্যা কমতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা চিন্তা করে নারীরা প্রথম সন্তান নষ্ট করতে চান। কিন্তু প্রথম সন্তান কখনোই নষ্ট করা যাবে না। তাই প্রতিটি নবদম্পতির প্রথম সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারীর সাথে আলোচনা করা দরকার এবং পরামর্শ অনুযায়ী সন্তান নেওয়া উচিত।

## সঠিক সময়ে সন্তান নেওয়ার সুবিধা

- সঠিক সময়ে বিয়ে ও সন্তান নিলে একজন মেয়েকে শারীরিক, মানসিক অর্থনৈতিক সবদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় না এবং পরবর্তীতে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে না।
- ২০ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একজন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে পারিবারিক চিন্তা-ভাবনা, দায়িত্ববোধ এবং জীবনবোধে পূর্ণতা আসেনা। কাজেই এসময় বিয়ের মাধ্যমে তাদের ওপর বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে তা তারা সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। এতে তারা একান্তভাবে মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়। ফলে সংসার জীবন সুখের হয় না।

- অল্পবয়সে গর্ভধারণ করলে নানারকম শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। যেমন: পেলভিস যার স্বাভাবিক প্রসবের জন্যে স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রয়োজন, কিন্তু তার আগেই গর্ভবতী হওয়ার কারণে স্বাভাবিক প্রসবের পরিবর্তে অস্ত্রোপচার করে প্রসব করানো প্রয়োজন হয়। এছাড়া স্বাভাবিক প্রসবের সময় অপর্যাপ্ত বার্থ ক্যানালের জন্য প্রসবের সময় শিশু অনেকক্ষণ আটকে থাকার কারণে ফিস্টুলা হওয়ার ঝুঁকিও বেশি থাকে এবং ভবিষ্যতে বন্ধ্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- অনিরাপদ গর্ভপাতজনিত কারণে কিশোরী ও কমবয়সী নারীরা দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতা এমনকি মৃত্যুঝুঁকি ও মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় কম বয়সী নারীদের মধ্যে গর্ভপাতের হার অনেক বেশী।
- ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীর গর্ভধারণ এবং শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রে জটিলতা কিশোরী মায়েদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ।
- ২০-২৯ বছর বয়সী সন্তান জন্মদানকারী মায়েদের তুলনায় ২০ বছরের কম বয়সে সন্তান জন্মদানকারী মায়েরা ৫০ শতাংশ বেশি মৃত শিশু জন্ম দেন অথবা জন্মের পর শিশুর মৃত্যু ঘটে এবং কম জন্ম ওজনের শিশুও জন্ম দেয়।
- বাল্যবিবাহের কারণে কিশোরী মেয়েদের মধ্যে যারা সাধারণত বয়স্ক স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাদের যৌন সম্পর্কে মতবিরোধপূর্ণ সহিংস হওয়ার অভিজ্ঞতা বেশি ঘটে। বিবাহিত মেয়েরা নিজেরা কিশোরী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়শঃই বিয়ের পর পরই সন্তান নিতে স্বামীর পক্ষ হতে চাপে পড়ে।
- কিশোরী অবস্থায় শারীরিক এবং মানসিক পরিপক্কতা না থাকায় সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে একজন মেয়ের ভালো ধারণা থাকে না। কাজেই এ বয়সে সন্তান জন্মদান করলে তার পক্ষে সন্তানের সঠিক যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে সন্তানের সঠিক বেড়ে ওঠা বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- অল্প বয়েসে সন্তান নিলে নারীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
- অল্প বয়সী স্বামী-স্ত্রী সাংসারিক বিষয়ে অনেক সময় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে পারিবারিক জীবনে অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- সাংসারিক অশান্তি এড়াতে স্বামীরা সংসার-বিমুখ হয় এবং পুনরায় বিয়ে করতে বা স্বামী-স্ত্রী আলাদা হতে আগ্রহী হয়। ফলে অধিক হারে বিবাহ বিচ্ছেদ, নারী নির্যাতন ও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।
- কিশোরী অবস্থায় সন্তান জন্ম দিলে মায়ের শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং নানা ধরনের অসুখ-বিসুখে ভুগতে থাকে।

ফলে সে স্বামী সন্তানের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এতে পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয় এবং সে সংসারের সবার অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়। পরিশেষে চিকিৎসার অভাবে অনেক কিশোরী মা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

- বাল্য বয়সে বিয়ে হলে পরিবারে সন্তানসংখ্যা বেশি হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এতে সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। মা-বাবার ওপর নির্ভরশীল অল্পবয়সী বেকার ছেলে তখন স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে নিয়ে আর্থিক দিক থেকে প্রচুর চাপের সম্মুখীন হয়, তার জীবন হয়ে ওঠে হতাশাপূর্ণ ও নিরানন্দময়।
- বাল্য বয়সে যেহেতু ছেলে বা মেয়ে স্বাবলম্বী হয় না, তাই ছেলেকে বিয়ে করিয়ে মা-বাবা যৌতুক দাবি করেন এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়ের মা-বাবা এ দাবী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় মেয়েকে নির্মম যৌতুকের বলি হতে হয়।

## বিয়ের পর অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভাবস্থা প্রতিরোধ

আপনি যদি গর্ভাবস্থা এড়িয়ে চলতে চান, তাহলে বিভিন্ন রকমের গর্ভনিরোধ পদ্ধতি আছে যা ব্যবহার করতে পারেন। আপনাদের মত দম্পতির জন্য কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযুক্ত তা জেনে নিন। কনডম হচ্ছে একমাত্র গর্ভনিরোধ পদ্ধতি যা গর্ভাবস্থা এবং যৌনরোগ সংক্রমণ দুটোই প্রতিরোধ করে। ঠিক কখন নারীর ডিম্বোস্ফোটন হবে তা সঠিকভাবে জানা কষ্টকর ব্যাপার। তাই গর্ভাবস্থা এড়িয়ে চলতে চাইলে, অনিরাপদ মিলন থেকে বিরত থাকতে হবে। যে নারী গর্ভবতী হতে চাইছেন না, তার অনিরাপদ মিলনের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। যে নারীর মাসিক চক্র স্বল্পস্থায়ী তিনি মাসিকের সময় সহবাস করলেও তার গর্ভাবস্থার ঝুঁকি থাকে। কারণ পুরুষের শুক্রাণু একজন নারীর ডিম্বনালিতে প্রায় ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

মেয়েদের যোনীপথে যে লালা নিঃসরণ হয়, তা মাসিক চক্রের সাথে সাথে বদল হয়। যখন কারো ডিম্বস্ফোটনের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন এই লালা পাতলা এবং পিচ্ছিল হয়ে যায় এবং শরীরের তাপমাত্রা তখন ০.৪-০.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেড়ে যায়। যদি ৪ থেকে ৫ মাস এই সব লক্ষণসমূহ এবং অন্যান্য শারীরিক লক্ষণ যেমন: তলপেটে ব্যথা; নিবিড় পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা যায় তাহলে একজন নারী নিজেই মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন তার কখন ডিম্বস্ফোটন হচ্ছে। যদি নিজে এটি করতে না পারেন বা যদি এই সময় গণনা করতে সমস্যা হয়, তাহলে একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।

## সন্তান ধারণের জন্য নারীর উপযুক্ত ও নিরাপদ বয়স

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ২০ থেকে ৩০ বছর বয়স নারীর সন্তান ধারণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কারণ, এর পর থেকে জননক্ষমতা কমে যেতে থাকে এবং গর্ভকালীন নানা রকম জটিলতার হারও বেড়ে যায়। মেয়েদের বয়স ৩০ পার হওয়ার আগেই অন্তত প্রথম সন্তান ধারণ করা মা ও সন্তান উভয়ের জন্যই নিরাপদ, তবে কোনোভাবেই ২০-এর আগে নয়। ৩০-এর পর মা হতে চাইলে প্রস্তুতি হিসেবে উচিত হবে আগেই কোনো প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করে গর্ভধারণ করা উচিত যাতে পরবর্তী সময়ে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। ৩০-এর পর গর্ভকালীন ডায়াবেটিস, গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ, প্রসবপূর্ব রক্তক্ষরণ, বাচ্চা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি ও প্রসবকালীন জটিলতার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে। এসবের সঙ্গে আরেকটি সমস্যা যুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা হলো জন্মগত ত্রুটিযুক্ত সন্তানের জন্মদান। সার্বিকভাবে সন্তান ধারণের জন্য নারীদের ২০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত বয়স সবচেয়ে নিরাপদ ও উপযুক্ত। এর নিচে ও উপরে ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

# ৮.

# সমঝোতায় সুখের সংসার

নববিবাহিত দম্পতি বিয়ের আগেই হয়তো একজন আরেকজনের পছন্দ-অপছন্দ জেনে নেন। বিয়ের আগেই তারা বুঝতে পারেন একজনের সাথে আরেকজনের কতখানি মিল হবে। বিয়ের পরেও কিন্তু এই পারস্পরিক বোঝাপড়া চলতেই থাকে। এবং এই বোঝাপড়া করতে পারলেই প্রকৃত অর্থে ভবিষ্যতে একটি সুখী ও সুন্দর জীবন-যাপন করা সম্ভব। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের সাফল্য, কল্যাণ এবং ঘনিষ্টতা নির্ভর করে স্বামী ও স্ত্রীর গভীর বন্ধনের উপর। বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভালো জীবনাচরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা এবং ভালো ব্যবহার নতুন সংসারকে সুন্দর ও সার্থক রূপদান করতে পারে।

দাম্পত্য জীবনে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। বিবাহিত জীবনে মনে রাখা দরকার প্রত্যেক মানুষেরই আলাদা সত্তা রয়েছে। সবসময় দু'জনের মতামত মিলবে না, তদুপরি একজন আরেকজনকে বুঝতে হবে এবং এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে। সাময়িক বিরক্তি, রাগ বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খারাপ আচরণ করা আপনার জীবনের আনন্দটাকে মাটি করে দিতে পারে। সত্যিকার অর্থে একজন মানুষ যখন রেগে যায় তখন সে বাস্তবতা চিন্তা করতে পারে না, তাই রাগের মাথায় পারস্পরিক সম্পর্ক ও জীবন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক না।

যৌথ জীবন সুন্দর হবে, সুখী হবে এই চিন্তা থেকেই মানুষ যৌথ পথচলা শুরু করে। কিন্তু এই জটিল সমাজ ব্যবস্থায় দম্পতিদেরকে প্রতিনিয়ত অনাকাঙ্খিত চ্যালেঞ্জ, বাইরের প্রভাব এবং সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এবং আমরা প্রত্যেকেই জানি, আমরা যেরকম জীবনকে বা পৃথিবীকে দেখতে চাই, পৃথিবী হয়তো সেরকম নয়। এ কারণে দু'জনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই জটিল পৃথিবীতে খুবই ধীরস্থির এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে শোনা ও ধৈর্য ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্য দিয়ে বিবাহিত জীবনের একঘেয়েমি দূর করার জন্য প্রাত্যহিক জীবনে মাঝে মাঝে একটু পরিবর্তন ও ভিন্নতা নিয়ে আসতে হয়। দু'জন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোথাও ঘুরে আসা যায়, আত্মীয়দের সাথে দেখা করে আসা যায়, নাটক বা সিনেমা দেখা যায় বা কোন ধর্মীয় তীর্থস্থান ঘুরে আসা যায়। নিদেনপক্ষে বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে একবেলা খাবার খেয়ে আসা যায়। এতে করে খাবারের সময় দু'জনে গল্প করার অনেক সময় পাওয়া যায় এবং এগুলোর মধ্যে দিয়ে দু'জন অনেক আনন্দের মধ্যে এবং ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে। একইভাবে বই পড়া, ভালো গান শোনা অথবা পছন্দের কোনো শখ যেমন গাছ লাগানো, বাগান করা, হাঁস-মুরগি পালন, বাড়ি বা আঙ্গিনার পাশে সবজি চাষ ইত্যাদি মনকে প্রশান্তি দেয়। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে তাও আপনার মনে প্রশান্তি এনে দিতে পারে।

টেলিভিশনে ভালো ভালো অনুষ্ঠানগুলোই শুধু দেখা উচিত। বেশিরভাগ পরিবারে দেখা যায় টেলিভিশন দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ, আলাপচারিতার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু স্বামী-স্ত্রী নয়, সন্তান এবং পরিবারের অন্যান্যদের সাথেও গল্পগুজব করা বন্ধ হয়ে যায় টেলিভিশনের জন্য। বিশেষ করে অল্পবয়সীদের খাবার খেতে খেতে টেলিভিশন দেখা একটি বদ অভ্যাস এবং এটা খাবারের পুষ্টিমানকে প্রভাবিত করে।

এর সাথে সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন অ্যাপস্ বিশেষ করে ফেসবুক যুব বয়সীদের মধ্যে ক্ষতিকর আসক্তির জন্ম দিয়েছে। যার ব্যবহার হতে পারতো জ্ঞান আহরণ, তথ্য বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার একটি কল্যাণজনক মাধ্যম তার অসংযত এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং কখনও কখনও দুর্বিষহ করে তুলছে। তাই সংসার জীবনে পারস্পরিক মনের মিল ও সমঝোতা বজায় রেখে সুখের সংসার গড়ে তোলার জন্য এইসব বিনোদন ও যোগাযোগ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রিত ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী।

## দাম্পত্য জীবনে কোনো সমস্যা দেখা দিলে করণীয়

যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে তা মনের ভেতরে পুষে না রেখে বরং সরাসরি সঙ্গীর সাথে খোলামেলা আলোচনা করা ভালো। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দু'জন মিলে বয়োজ্যেষ্ঠদের  কাছ থেকেও পরামর্শ নিতে পারেন, যাতে করে সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়।

সমস্যাহীন কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই। সুতরাং দু'জন মানুষ যখন দিনের পর দিন একই ছাদের নিচে থাকবে তখন তাদের মধ্যে নানারকম বিষয় নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে এটাই বাস্তব। দু'জনে সরাসরি খোলামেলা আলোচনা করে সমাধান করুন। মানুষ মাত্রই ভুল করবে। সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এমন কখনো মাথায় গেঁথে রাখবেন না যে, আমি কখনো ভুল করতে পারি না। ভুল বোঝাবুঝির দেয়াল বাড়তে দেবেন না। নিজের ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথেই তা স্বীকার করে ফেলুন এবং দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলুন।

**পরিবারের জন্য ক্ষতিকর বদঅভ্যাস**

যারা ধূমপান করেন তারা স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব যেমন- ফুসফুস ক্যান্সার, হৃদরোগ ইত্যাদিতে ভোগেন। ধূমপান দীর্ঘমেয়াদী রোগ এবং ভোগান্তি তৈরি করে, এমনকি অকাল মৃত্যুও হয়। স্বামী যদি ধূমপায়ী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই স্ত্রী এবং সন্তানের সামনে ধূমপান পরিহার করতে হবে। স্ত্রী যদি সন্তান সম্ভবা হন তাহলে ধূমপান গর্ভের সন্তানের জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। ধূমপানের কারণে সন্তানের সার্বিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং কম ওজনের শিশু জন্ম নেয়। রান্নার সময় চুলার ধোঁয়ায় গর্ভবতী মায়ের জন্য ক্ষতিকর। সবদিক বিবেচনা করে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে ধূমপান ত্যাগ করা। আর কোনোভাবেই তা সম্ভব না হলে ঘরে আসার পর ধূমপান না করাই উত্তম। এছাড়া নেশাজনিত অন্যান্য বদ অভ্যাস পরিবারের কলহ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাঝেমাঝে এটা পরিবারের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘরের কাছে কারখানার ধোঁয়া, রাস্তার গাড়ির ধোঁয়াও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বাড়ি ভাড়া নেওয়া বা ঘর বানানোর সময় এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং এতে যেন কোনো সমস্যা না হয় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

## বিয়ের পরে সুখ

অনেকে মনে করেন বিয়ের পরে সুখ চলে যায়। কিন্তু এই ধারণাটি সঠিক নয়। শুধুমাত্র দু'জন দু'জনকে বোঝার ব্যাপার মাত্র। টাকা-পয়সা, সৌন্দর্য বিবাহিত জীবনকে সুখী করতে পারে না। দাম্পত্য সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আন্তরিকতা। বিনীত, নমনীয়, বিশ্বাসযোগ্য, ভালো স্বভাব, সহযোগী মনোভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, উদার ও ধৈর্যশীল গুণগুলো সংসার টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই দু'জন মানুষের মধ্যে বন্ধুভাবাপন্ন মানসিকতা তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন বন্ধু আপনাকে যতটা ভালো বুঝতে পারবে সেটা অন্য কেউ বুঝতে পারবেনা। আর একজন বন্ধুর কাছেই মানুষ তার ভালোলাগা, মন্দলাগা, ভয়, অভিমান, প্রত্যাশার কথা, সমস্যার কথা নির্দ্বিধায় শেয়ার করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সবচেয়ে কাছের মানুষটি হলো স্বামী বা স্ত্রী। তাই দু'জন দু'জনার ভালোলাগা, মন্দ লাগা, জীবনের ভাল সময় খারাপ সময়,ভাল মুহূর্ত খারাপ মুহূর্ত তার সাথে শেয়ার করুন এতে করে পরিস্থিতি অনুযায়ী একে অপরকে বুঝতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না।

**দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সম্মানবোধ**

দাম্পত্য জীবনে বর্তমানে যে সমস্যাটি বেশি দেখা যায় তা হলো সম্মানের অভাব। যার কারণে সৃষ্টি হয় মতভেদ। আর তা বাড়তে বাড়তে বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়াতে দেখা যায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই উচিত একে অপরকে মানুষ বা বন্ধু হিসেবে শ্রদ্ধা করা। শ্রদ্ধাবোধ যেকোনো সম্পর্ককে আরও নতুন মাত্রা দেয়। কখনো এমন কোনো কথা বলবেন না বা কাজ করবেন না যা অন্য মানুষের আত্মসম্মানে আঘাত করে। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের কাছে তার আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। সবসময় নিজের মতামতকে জাহির করা এবং তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু ইচ্ছে বা মতামত থাকতে পারে। এ সত্যকে ভুলে গেলে চলবে না। মাঝেমাঝে পরিস্থিতি ভেদে অন্যের মতামত শুনুন এবং মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন। ফলে অপর পাশের মানুষটি যখন বুঝতে পারেন যে তার মতামতও গুরুত্ব পাচ্ছে তখন তিনিও আপনার কথার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবেন। আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার মতামত থেকে অপর মানুষটির মতামত বেশি উত্তম এবং যৌক্তিক। এজন্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দু'জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে এবং উভয়েরই পারিবারিক মূল্যবোধকে সম্মান করতে হবে। সেই সাথে স্বামী-স্ত্রী তাদের উভয়েরই একে অপরের শ্বশুর-শ্বাশুড়ির প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

**একঘেয়ে জীবন কাটিয়ে উঠার উপায়**

প্রতিদিন একই রুটিন মেনে জীবন চালাতে থাকলে তা মানুষের মনকে কাঠখোট্টা করে তোলে। যান্ত্রিক জীবন থেকে মাঝেমধ্যেই সুযোগ করে সঙ্গীকে নিয়ে সামর্থ্যানুযায়ী দেশের ভেতরে বা বাইরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন। এর ফলে আপনার মধুর মুহূর্ত বাড়বে যা আপনাদের সম্পর্কের ভালো থাকার সঞ্জীবনী হিসেবে কাজ করবে। ছোট ছোট মুহূর্ত উদ্‌যাপন করুন। যেমনঃ জন্মদিন পালন করুন, বিবাহ বার্ষিকী পালন করুন অথবা কোনো জোছনা ভরা রাত কাটাতে পারেন ছাদে বসে চাঁদ দেখে, নিজের অথবা সঙ্গীর যেকোনো ছোট বড় সাফল্যকে উদ্‌যাপন করতে পারেন, এতে সম্পর্কে নতুন প্রাণের সঞ্চার হবে।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মনের মিল। মনের মিল না থাকলে সংসার জীবনে সুখী হওয়া যায় না। আর সবসময় মনের মিল নাও হতে পারে। তাই বলে অন্য কারও তুলনা টেনে আনবেন না। এতে কারো সঙ্গী হীনমন্যতায় ভুগতে পারেন। যেকোনো সমস্যায় দুজনে খোলাখুলি কথা বলুন। পরস্পরের পছন্দ অপছন্দও জেনে নিন এবং গুরুত্ব দিয়ে তাকে বিবেচনায় নিন, দেখবেন সুখেই কাটছে সংসার।

## পারস্পরিক আকর্ষণ বাড়ানো এবং বন্ধন মজবুত করা

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজেকে সুন্দর ও পরিপাটি দেখানো। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী ঠিক এই রকমই। দু'জনেই পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর রুচিসম্পন্ন পোশাক পরে থাকলে দেখতে ভালো লাগে এবং অন্যের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হতে পারে যে, বাড়িতে যেকোনো কাপড়ে থাকলেই হলো। কিন্তু যারা সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছে, তাদের দেখলে বুঝবেন পরিবারে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং পরিপাটি হয়ে থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। যখন স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই পরিষ্কার ও গোছানো থাকেন তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বাড়ে এবং বন্ধন মজবুত হয়।

**বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখা**

যখন বাড়ির বাইরের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তখন বোঝা যায় যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া আছে। শুধু আঙ্গিনা না বরং বাড়ির ভেতর যেমন, টয়লেট, শয়নকক্ষ, রান্নাঘর এবং বাড়ির ভেতরের অন্যান্য জায়গাও পরিষ্কার রাখা জরুরী। পরিধানের কাপড় এদিক সেদিক না ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখতে হবে।

**সঙ্গীর প্রতি প্রতিশ্রুতি**
সঙ্গীকে বুঝতে দিন যে সে আপনার কাছে কতটা মূল্যবান। সঙ্গীর প্রয়োজনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিন। যখন আপনি এরকম অনুভূতি সঙ্গীকে বুঝতে দিবেন, তখন দেখবেন সঙ্গীও আপনার প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল হয়ে উঠবে। যেমন: স্ত্রী হয়তো অসুস্থ বা জ্বরে ভুগছে, এই সময় সে যদি আপনাকে ভাত রান্না করতে অনুরোধ করে বা সন্তানকে স্কুলে দিয়ে আসতে বলে, আপনি তাকে সাহায্য করুন এবং বুঝতে দিন যে আপনার শত ব্যস্ততার মধ্যেও তার প্রয়োজন, সংসারের প্রয়োজন আপনার কাছে অনেক বেশি। প্রত্যেকে নিজের দিক থেকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করার চর্চা করুন। স্ত্রীকেও তার স্বামীর প্রতি অনুরূপ সহানুভূতিশীল আচরণ করা উচিত।

## সংসারের ব্যবস্থাপনা

অনেক সময় ঘরে কাপড়-চোপড় অগোছালো থাকে। রান্নাঘরে ব্যবহৃত থালা-বাটি বা রান্নার হাড়ি আধোয়া অবস্থায় থাকে। বসার ঘরের চেয়ারে বা সোফায় পর্যন্ত কাপড়-চোপড় পড়ে থাকে। দু'জনে আলাদা আলাদা ভাবে ব্যস্ত। স্বামী হয়তো অফিসের কাজ করছেন বাড়িতে বাইরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে গেছেন, স্ত্রী হয়তো একা একা সামলাতে পারছেন না বা পাশের বাসায় গল্প করতে গেছেন। এই রকম পরিস্থিতি এড়াতে দু'জন মিলে সময়ের ব্যবস্থাপনা করতে হবে। কে কখন কোন কাজ করবেন, কে কীভাবে সাহায্য করবেন তা জানা থাকলে এবং দু'জনেই আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে সুন্দর, ছিমছাম ও পরিপাটি থাকা যায়। আপনার ভালো থাকা অন্যকেও ভালো থাকতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। কেউ হয়তো ঘুম থেকে আধঘন্টা আগে উঠে গুছিয়ে নিলেন বা বাড়িতে অফিসের কোনো কাজ নিয়ে আসলেন না। যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনে ঘরের কাজ ভাগাভাগি করে নেন এবং একজন আরেকজনকে সাহায্য করেন, তাহলে এ ধরণের সমস্যা তৈরি হবে না।

**সাংসারিক খরচের ব্যবস্থাপনা**

সংসারে আয় ও ব্যায়ের ব্যবস্থাপনা দু'জনে মিলে পারস্পরিক সম্মতিতে করতে হবে। যেহেতু দু'জনেই পরিবারের আয় সম্পর্কে অবগত থাকেন, সেহেতু কিভাবে পরিকল্পনা করে খরচ করলে ভালো থাকা যায় সেসম্পর্কে দু'জনের পরিকল্পনার সমন্বয় থাকা ভালো। যখন যা সংসারের জন্য অপরিহার্য, তখন তাই কিনতে হবে। ভবিষ্যতের জন্যেও কিছু সঞ্চয় করতে হবে। অর্থ হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা বেঁচে থাকার জন্য, সংসারকে সুন্দর করার জন্য অপরিহার্য। আবার অর্থ আয়ের নেশা এবং অপরিকল্পিত খরচ সংসারে অশান্তি আনার জন্য যথেষ্ট।

**ধৈর্য ধারণ করা**

মাঝেমাঝে খুব অল্প কিছুতেই আমারা রেগে যাই। ভাত একটু নরম হলে, তরকারিতে লবণ কম হলে আমরা তাৎক্ষণিক বিরক্তি প্রকাশ করি। আবার কাপড় ধোয়ার সময় এক কাপড়ের রং লেগে অন্য কাপড় নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের বিরক্তির সীমা থাকে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কেউ ইচ্ছা করে এই কাজগুলো করে না। এই সময় ধৈর্য ধারণ করা খুবই জরুরি। দাম্পত্য জীবনে দু'জনের মধ্যে কারো হয়তো হঠাৎ করে রাগ উঠে যেতে পারে। অন্যজনকে তখন ধৈর্য ধরতে হবে, শান্ত থাকতে হবে।

**নিজের ধারণা বিনিময় করা**

কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন যে দীর্ঘদিন কীভাবে সুখী দাম্পত্য জীবন কাটানো যায়, তাহলে এর সর্বোত্তম উত্তর হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ধারণা বিনিময়। পরস্পরের ধারণা, পছন্দ, অপছন্দ সম্পর্কে জানা থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘর সাজানো, খাবারের পছন্দ, সংসারের বাইরে প্রত্যেকের বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে ধারণা, পারিবারিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিজেদের ধারণা বিনিময় করলে যৌথ সিদ্ধান্ত নেয়া যায় আবার ভবিষ্যতের কোন জটিলতা, অবিশ্বাস বা অশান্তি এড়ানো যায়। সব সময় শুধু কথা দিয়েই অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে হবে এমন নয়, তাকানো, দেহভঙ্গিমা এবং শারীরিক ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে যে, নিজের অভিব্যক্তি বা ধারণা প্রকাশ যেন অন্যের মনঃকষ্টের কারণ না হয়। এই কারণে সঙ্গীর আবেগ, অনুভূতি, পছন্দ, অপছন্দ, ভালো-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

# ৯.

# পরিবার পরিকল্পনা

সাধারণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বোঝানো হয়ে থাকে।প্রকৃত অর্থে পরিবার পরিকল্পনার সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। একটি পরিবারের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি দম্পতি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সচেতনভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকেই বলা যায় 'পরিবার পরিকল্পনা'। যেকোনো পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো সুন্দর ভবিষ্যৎ গঠন করা। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবারের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতিসাধন করাই পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য। স্বামী-স্ত্রী মিলে আলোচনা করে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই পরিবার পরিকল্পনা। একটি সক্ষম দম্পতি তাদের আয় ও সামাজিক অবস্থার সাথে মিল রেখে কখন কয়টি সন্তান গ্রহণ করবেন, দুটি সন্তানের মাঝে কতদিনের বিরতি দেবেন তা ঠিক করা এবং সে অনুযায়ী যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করাই হলো পরিবার পরিকল্পনা। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে একটা বড় ঝুঁকি হচ্ছে, দম্পতিদের স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতা। বাংলাদেশে বর্তমানে শতকরা ৫৪ জন সক্ষম দম্পতি আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি (খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্ট, আইইউডি বা কপার-টি ও স্থায়ী পদ্ধতি) ব্যবহার করে থাকেন, এর মধ্যে শতকরা ৪৫.৮ ভাগ দম্পতি স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতিগুলো (খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকশন) ব্যবহার করে থাকেন। দেখা গেছে স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতিগুলো ছেড়ে দেওয়ার হারও বেশি হয়ে থাকে। গ্রহীতা সঠিক নিয়মে বড়ি খেতে ভুলে গেলে এবং অন্য কোনো বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার না করলে গর্ভধারণের আশঙ্কা থাকে। দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতি (ইমপ্ল্যান্ট, আইইউডি, টিউবেকটমি ও এনএসভি) ব্যবহারের হার খুব কম। এই হার বর্তমানে ৮ দশমিক ১ শতাংশ। প্রায় এক দশক ধরে দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানোর চেষ্টা চলছে, কিন্তু খুব বেশি সফল হওয়া যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সরকারের উচিত দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া।

> বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি মিনিটে সারা পৃথিবীতে জন্মায় ২৫০ শিশু; তার ৯ জন শুধু বাংলাদেশেই জন্মাচ্ছে। বলা হয়ে থাকে, উন্নয়নের 'বেস্ট বাই' হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। পরিবার পরিকল্পনাতে প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগ উন্নয়নকে ফেরত দেয় ১৪ ডলার। পরিবার পরিকল্পনা ৩০ শতাংশ মাতৃ মৃত্যুকে থামিয়ে দিতে পারে, প্রতিহত করে ২০ শতাংশ নবজাতকের মৃত্যু, কমিয়ে দেয় ৬৬ শতাংশ অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ এবং ৪০ শতাংশ অনিরাপদ গর্ভপাত।

সুস্থ পারিবারিক জীবন মানে এমন একটি জীবন যেখানে জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো খুব সুন্দর, সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পূরণ করা যায়। টানাপোড়নের সংঘাতে জীবন এখানে খুঁড়িয়ে চলে না। তাই সুস্থ পারিবারিক জীবন গঠনে এমন একটি জীবনের কথা চিন্তা করতে হবে যেখানে জীবন অর্থাভাবে, স্থানাভাবে ও চিকিৎসার অভাবে ভারাক্রান্ত নয়।

আর এরকম সুস্থ বা স্বাস্থ্যকর জীবন গঠনের মূল কথা হলো পরিবার পরিকল্পনার সঠিক পথটি সময়মতো বেছে নেয়া। যেমন যদি নবদম্পতি বিয়ের পর পরই সন্তানের বোঝা নিতে না চান, নতুন জীবনের সুমধুর আস্বাদে কিছুদিন নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় অতিবাহিত করতে চান, পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য কিছুদিন সময় চান তাহলে পরিবার পরিকল্পনাই হচ্ছে উত্তম পন্থা যেখানে সংসারে দু'জন মিলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে নেন। বর্তমানে আপনার আর্থিক অবস্থা যদি সন্তান লালন-পালন করার অনুকূলে না হয়, অনাবশ্যক একটি সন্তানের

বোঝা বাড়িয়ে সংসারে অভাব ও অনটনকে টেনে আনার কোনো মানে হয় না–এমন অবস্থায় আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে যাতে স্ত্রীর গর্ভে অনভিপ্রেতভাবে সন্তান জন্ম না নেয়।

কেউ হয়তো সদ্য বিয়ে করেছেন বা বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন যেখানে তারা একটু দেরিতে সন্তান নিতে চান। কারও আবার একটি সন্তান আছে, পরের সন্তান নেওয়ার আগে কয়েক বছরের বিরতি চান। কেউ হয়তো ইতিমধ্যে দুই সন্তানের বাবা-মা, তাই পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী কোনো পদ্ধতিতে যেতে চান। কেউ চান প্রসব পরবর্তী সময়ের জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, কেউ আবার চান গর্ভপাত পরবর্তী সময়ে। সবার চাহিদার কথা বিবেচনা করে পরিবার পরিকল্পনার নানা রকমের পদ্ধতি আছে। তবে একেক দম্পতির জন্য একেক রকম পদ্ধতি ভালো। সবার চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ পরামর্শ বা কাউন্সেলিং, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক পরিবার পরিকল্পনা সেবার দরকার হয়। সঠিক সময়ে সঠিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বেছে নিলে পরিবার ছোট থাকে ফলে আয় অনুযায়ী ভালোভাবে সংসার চালানো যায়, সন্তানদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা যায়, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ করা যায়।

## পরিবার পরিকল্পনা: জন্মবিরতিকরণ

স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলনের ফলেই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম নেয় । সন্তান ধারণে সক্ষম ১৫-৪৯ বছর বয়সী একজন নারীর ডিম্বকোষে অসংখ্য ডিম্বাণু জমা থাকে । সেখান থেকে প্রতি মাসে একটি ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়ে ডিম্ববাহীনালি দিয়ে জরায়ুর দিকে আসতে থাকে । এই পরিপক্ক ডিম্বাণুটি সেইসময় যদি পুরুষ শুক্রকীটের সাথে মিলিত হয় তাহলে গর্ভসঞ্চার হয় । শুক্রকীটের সাথে মিলিত না হলে পরিপক্ক এই ডিম্বাণুটি মাসিকের রক্তস্রাবের সাথে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে । পরিবার পরিকল্পনার কোনো পদ্ধতি দ্বারা ডিম্বাণুকে পরিপক্ক হতে না দিলে বা পরিপক্ক ডিম্বাণু ও শুক্রকীটের মিলনে বাধা সৃষ্টি করা গেলে গর্ভসঞ্চার হতে পারে না । বিভিন্নভাবে গর্ভসঞ্চারে বাধা সৃষ্টি করা যায় । এগুলোকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বলা হয় । যেমন-

- ডিম্বাণু ও শুক্রকীটকে মিলিত হতে না দেয়া: যেমন- নারী ও পুরুষের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ বা কনডম ব্যবহার ।
- ডিম্বাণুকে পরিপক্ক হতে না দিয়ে এবং ডিম্বস্ফোটন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখেঃ যেমন- খাবার বড়ি, ইনজেকশন, ইমপ্ল্যান্টের ব্যবহার।
- ডিম্বাণু ও শুক্রকীট মিলিত হয়ে যে ভ্রূণের সৃষ্টি করে সেটিকে জরায়ুতে গ্রথিত হতে না দেয়া ঃ যেমন- আইইউডি'র ব্যবহার

## পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি চালু আছে। সরকারি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে বেশ কয়েকটি আধুনিক পদ্ধতি চালু আছে। বেসরকারি অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর বাইরেও কিছুসংখ্যক গ্রহীতা অন্যান্য গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

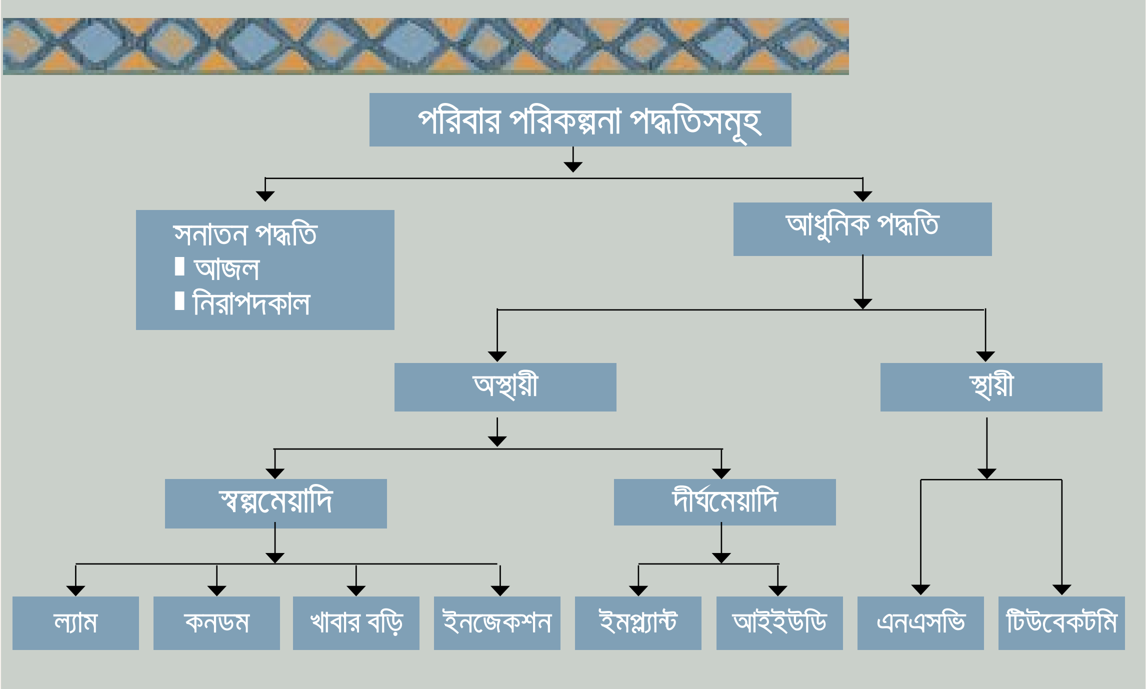


**পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে পুরুষদের যা জানা প্রয়োজন**

পরিবার পরিকল্পনা কি শুধু নারীর বিষয়? মজার ব্যাপার হলো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির চর্চাকারী মূলত নারী কিন্তু পরিকল্পনা প্রণেতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ। নারী কী পদ্ধতি ব্যবহার করবে, কবে থেকে করবে তা নির্ধারণ করে দিবে পুরুষ, কিন্তু পদ্ধতি ব্যবহার না করার দায়ভার পুরোটাই নারীর। জনপ্রিয়, বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো সবই নারীর জন্য বানানো এবং পুরুষের এখানে অংশগ্রহণ কম।

- পুরুষের পদ্ধতির চাইতে নারীদের জন্য পদ্ধতিগুলোতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা বেশি
- যেকোনো পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারবিধি, সুবিধা/অসুবিধা ইত্যাদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই জানা প্রয়োজন
- কনডম ব্যবহারে শুধুমাত্র জন্মরোধই করে না বরং কনডম যৌনবাহিত রোগ যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস, হেপাটাইটিস প্রতিরোধ করে
- খাবার বড়ি, ইনজেকশন ও ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহারের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতাগুলো পুরুষদের জানতে হবে এবং ব্যবহারকারীদেরকে সহায়তা করতে হবে।

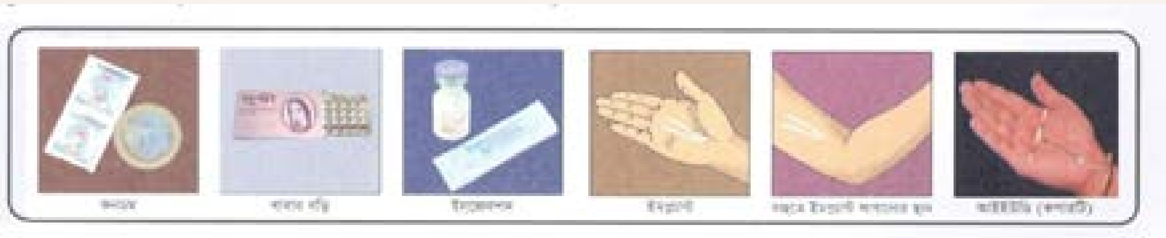

## দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ও এর প্রয়োজনীয়তা

একটি দম্পতি পরিবারের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অনেক চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গড়ে তোলেন। আর পরিকল্পিতভাবে পরিবার গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বাছাই করা। পরিবার পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদি পদ্ধতিসমূহ যেমন; খাবার বড়ি, কনডম, ইনজেকশন এবং জরুরি গর্ভনিরোধক বড়ি ছাড়াও অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি এবং স্থায়ী পদ্ধতি আছে যেমন; ইমপ্ল্যান্ট ও আইইউডি। আজ আমরা অস্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনার জন্য আধুনিক ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

### ইমপ্ল্যান্ট

- ইমপ্ল্যান্ট নারীদের জন্য নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং দীর্ঘমেয়াদি অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি। যারা দীর্ঘদিনের জন্য জন্মবিরতি চান, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন, যারা ইস্ট্রোজেন সমৃদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না।
- ইমপ্ল্যান্টে রয়েছে একটি বা দু'টি নরম ক্যাপসুল যা দেয়াশলাই-এর কাঠির চেয়ে ছোট যা নারীদের হাতের কনুইয়ের উপরে ভিতরের দিকে চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।
- বাংলাদেশে দুই ধরণের ইমপ্ল্যান্ট পাওয়া যায়। এক কাঠি ও দুই কাঠি বিশিষ্ট। একটি কাঠি তিন বছর এবং দুইটি কাঠি পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর থাকে।

### আইইউডি

আইইউডি নারীদের জন্য নিরাপদ, সুবিধাজনক এবং দীর্ঘমেয়াদি অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি। আইইউডি নারীদের জরায়ুর ভিতরে স্থাপন করা হয়, যা দশ বছর পর্যন্ত গর্ভধারণ বন্ধ রাখতে সাহায্য করে। বর্তমানে বাংলাদেশে কপার-টি ৩৮০-এ ব্যবহার করা হয়। যাদের অন্তত একটি জীবিত সন্তান আছে, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন, হরমোনাল পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন না অথবা যাদের দীর্ঘদিন অথবা আর কোনোদিন বাচ্চা নেয়ার ইচ্ছা নেই তারা আইইউডি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

### এনএসভি

পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতিকে বলা হয় ভ্যাসেকটমি। ভ্যাসেকটমিতে ছোট অপারেশনের মাধ্যমে শুক্রবাহী নালির কিছু অংশ বেঁধে কেটেদেয়া হয়। ফলে অন্ডকোষ থেকে শুক্রাণু শুক্রাণুবাহী নালি দিয়ে বীর্যথলিতে আসতে পারে না। এজন্য বীর্যপাতের সময় শুধুমাত্র বীর্য বের হয়, তাতে কোন শুক্রাণু থাকেনা। স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন হয় না বলে গর্ভ সঞ্চার হতে পারে না। পুরুষদের স্থায়ী পদ্ধতি বাংলাদেশে 'ভ্যাসেকটমি' বা 'এনএসভি (নো স্কালপল ভ্যাসেকটমি)' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বিশেষ পদ্ধতিতে একটি ছোট ছিদ্র করে এই অপারেশনটি করা হয় তাই একে এনএসভি বলে।

### টিউবেকটমি

নারীদের পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতিকে বলা হয় টিউবেকটমি। এই পদ্ধতিতে অপারেশনের সাহায্যে ডিম্ববাহী নালীর কিছু অংশ বেঁধে কেটে ফেলে দিয়ে স্থায়ীভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করা হয়। টিউবেকটমি অপারেশনে ডিম্বনালীর ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয়া হয় বলে ডিম্বাশয় থেকে প্রস্ফুটিত ডিম্বাণু ডিম্বনালী দিয়ে জরায়ুতে আসতে পারেনা এবং শুক্রাণুও ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছাতে পারে না। ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন না হওয়ার ফলে গর্ভ সঞ্চার হয় না।

## পরিবার পরিকল্পনার সুবিধা

একটি সুস্থ, সবল ও সুখী পরিবার সবার প্রত্যাশা। আর এজন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা। বিয়ের পর কখন প্রথম সন্তান নেবেন, পরবর্তী সন্তান আবার কবে নেবেন, কয়টি সন্তান নেবেন এসব বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে আলাচনা করে জন্মবিরতিকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

**পরিবার পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করলে উন্নয়নশীল দেশে...**

- ৬৬% অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ হ্রাস পাবে
- ৩০% মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব
- ২০% নবজাতকের মৃত্যু প্রতিরোধ করা যাবে
- ৪০% অনিরাপদ গর্ভপাত হ্রাস পাবে

ফলে, জনসংখ্যার ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, মেয়েদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, সর্বোপরি উন্নয়নশীল দেশসমূহ টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে

**পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করলে,**

- স্বামী-স্ত্রী পছন্দমত সময়ে এবং পছন্দমত সংখ্যায় সন্তান নিতে পারেন
- পরিবার ছোট থাকে ফলে আয় অনুযায়ী ভালোভাবে সংসার চালানো যায়
- একটি বা দুটি সন্তান থাকলে সন্তানদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা যায়, যথাযথ যত্ন নেওয়া যায়, তাদের পুষ্টিকর খাবার, প্রয়োজনীয় পোশাক ও শিক্ষা দেওয়া যায়
- চাহিদাসমূহ সহজে পূরণ করা যায়
- ঘন ঘন গর্ভধারণের ঝুঁকি কমায়, ফলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ঝুঁকি এবং মা ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমে
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে
- স্বামী ও স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক চাপ কমায়
- সংসারে সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায়
- অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ করা যায়
- এইচআইভি ও এইডসসহ বিভিন্ন যৌন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়
- সন্তানের পুষ্টিকর খাবার, প্রয়োজনীয় পোশাক ও শিক্ষা দেয়া যায়
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি কমায় ফলে দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যায়।

## প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা

সন্তান প্রসবের পর এক বছরের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ এবং ব্যবহার করাই হলো প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা। সন্তান জন্ম নেওয়ার কমপক্ষে দুই বছর বিরতির পরে গর্ভধারণ করলে মা ও সন্তান দু'জনেরই স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। কিন্তু কোনো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ না করলে প্রসবের চার সপ্তাহ পর আবার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এজন্য গর্ভবতী অবস্থায়ই পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে নারীদের উৎসাহিত করতে হবে।

**প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা সেবার প্রয়োজনীয়তা**

- মা ও শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করতে বিশেষ অবদান রাখে
- শিশু ও মায়ের মৃত্যু রোধ করে
- প্রসব পরবর্তী মায়েদের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে
- অনাকাংখিত গর্ভধারণ রোধ করার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত থেকে মাকে নিরাপদ রাখে
- প্রসব সেবার পাশাপাশি একই সময়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে
- বারবার সেবা কেন্দ্র যাতায়াতের খরচ ও সময় বাঁচায় এবং সহজে সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

**গর্ভধারণের জন্য সঠিক সময় এবং পরবর্তী সন্তান নেওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান**

দু'টি সন্তানের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান হওয়া উচিত তা নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রী কখন নিজেদের প্রস্তুত মনে করবেন এর উপর। নিজেকে প্রস্তুত মনে করার অর্থ হলো, আরেকটা সন্তান নেয়ার জন্য আপনারা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত কি না। যদি এই ব্যবধান কম হয় তবে প্রথম গর্ভধারণের সময় নিজের জন্য যেটুকু সময় পাওয়া গিয়েছিলো ততটুকু সময় পাওয়া যাবে না কারণ তখন নিজের যত্নের পাশাপাশি একটা ছোট শিশুরও দেখভাল করতে হয়। বড় ব্যবধানের ক্ষেত্রে প্রতিটি সন্তানকে আলাদাভাবে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়। এর ফলে সন্তান জন্মদানসংক্রান্ত খরচও পরিকল্পনা করে করা যাবে। শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক এবং সামগ্রিক বিবেচনায় দুটি সন্তানের মধ্যে অন্তত তিন বছরের ব্যবধান থাকা ভালো।

## গর্ভপাত পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা

যেহেতু গর্ভপাত-এর পর ১০ দিনের মধ্যে কোনো প্রজননক্ষম নারী আবার গর্ভবতী হতে পারেন, সে কারণে গর্ভপাতের পরপরই যেকোনো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় শারীরিক কারণে অনেক নারীরা এই সময় পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন না। তাদের স্বামীরাও কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন না। তাই কোনো কোনো নারীকে তাঁর জীবন রক্ষা করার জন্য দু-তিনবার পর্যন্ত গর্ভপাত করাতে হচ্ছে। বারবার গর্ভপাত করার ক্ষতিকর দিকগুলি বিশেষত প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ, সহবাসে ব্যথা, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন না থাকায় নারীদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।

### গর্ভপাতের পর বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি শুরু করার উপযুক্ত সময় নিচে বর্ণনা করা হলো:

| পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি | গর্ভপাত পরবর্তী সেবা | মিনিস্ট্রুয়াল রেগুলেশন উইথ মেডিকেশন (এমআরএম)-এর পরবর্তী সেবা |
|---|---|---|
| কনডম | যখন নারী মনে করে যে যৌন মিলনের জন্য প্রস্তুত | এমআরএম শুরু করার প্রথম দিন |
| খাবার বড়ি | সেবা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে | এমআরএম শুরু করার প্রথম দিন |
| ইনজেকশন | সেবা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে | এমআরএম শুরু করার প্রথম দিন |
| ইমপ্ল্যান্ট | সেবা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে | এমআরএম শুরু করার প্রথম দিন |
| আইইউডি | সেবা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে | যখন নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে, যে তিনি গর্ভবতী নন বা জরায়ু সম্পূর্ণ খালি করা হয়েছে |
| টিউবেকটমি | সেবা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে | ম্যানুয়াল ভ্যাকুয়াম অ্যাসপিরেশন (এমভিএ)-করার পর |
| প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি | সেবা নেয়ার পর একটা মাসিক চক্র ভালোভাবে হয়ে যাওয়ার পর | এমআরএম-এর পর একটা মাসিক চক্র ভালোভাবে হয়ে যাওয়ার পর |
| জরুরি জন্মবিরতিকরণ পিল | প্রয়োজন অনুসারে অরক্ষিত যৌনমিলনের ৫ দিনের মধ্যে | প্রয়োজন অনুসারে অরক্ষিত যৌনমিলনের ৫ দিনের মধ্যে |

## গর্ভপাত পরবর্তী সেবায় নারীর নিজের ও পুরুষের ভূমিকা

- গর্ভপাত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, দুর্ঘটনায় বা জীবননাশের আশংকা থেকেই হোক, নারীর জন্য এটা অনেক বড় একটি ধাক্কা ও কষ্টের বিষয়। এসময় স্বামী হিসাবে স্ত্রীর পাশে থাকা জরুরি
- গর্ভপাতের পর যেকোনো ধরনের সংক্রমণ, আঘাত বা রক্তক্ষরণের ফলে নারী যদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করতে না পারেন কিংবা এই সময় কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করতে না চান তাহলে পুরুষকে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং স্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে
- গর্ভপাতের পর আরেকটি সন্তান নিতে তাড়াহুড়ো না করা। একটি গর্ভপাতে নারীর শরীরের যে ক্ষতি হয়, সেটা পূরণ হবার সময় দিন। এবং পরবর্তীতে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে সন্তানের জন্য চেষ্টা করা
- গর্ভপাত কেবল স্ত্রীর শারীরিক ক্ষতি নয়, তাঁর মানসিক ক্ষতিও। এই উভয় ক্ষতি থেকে সেরে ওঠা, তাঁকে শারীরিক বিশ্রাম ও মানসিকভাবে শক্তি যোগানো
- অকাল গর্ভপাতের জন্য স্ত্রীকে দোষারোপ না করা। বরং গর্ভকালীন সময়ে নারীকে ঘরের ভারি কাজ করানো থেকে বিরত রাখা
- অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধে গর্ভপাতের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার বা সেবাপ্রদানকারীর কাছে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা
- গর্ভপাত পরবর্তী ফলো আপ সেবা নেওয়ার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া
- ভবিষ্যতে অপরিকল্পিত গর্ভধারণ পরিহারের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও গর্ভজনিত অসুস্থতা কমিয়ে আনতে নারী পুরুষ উভয়কেই সচেতন হতে হবে এবং সময়মত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

# ১০.

# মায়ের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং নবজাতকের যত্ন

পৃথিবীতে নব জীবনের আবির্ভাব ও আগমন যেমন আনন্দের, গর্ভধারণ ও শিশুর জন্ম, মাতা-পিতা ও পরিবারের জন্য তেমনি আনন্দের বিষয়। যে সমাজে নারীর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়া হয় এবং নারীর সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ়, সেই সমাজে নারীর স্বাস্থ্য ও জীবন বিপন্ন হয় না বললেই চলে। নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশুর জন্মের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ নির্ভর করে একজন গর্ভবতী নারী ও নবজাতক কতখানি যত্ন ও মনোযোগ সমাজ ও পরিবার থেকে পেয়ে থাকে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা, স্বাস্থ্যসেবার কী কী সুবিধা এবং প্রয়োজনের সময় কী ঔষধ ও জরুরীভাবে কী পরিচর্যা পাওয়া যায় তার উপর।

মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য পরস্পরের সাথে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, অনেক ক্ষেত্রে একই ধরণের অত্যাবশ্যকীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। যার মধ্যে আছে প্রসবকালীন পরিচর্যা , জন্মের সময় দক্ষ তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনীয় জরুরী প্রসূতি সেবার প্রাপ্তি, পর্যাপ্ত পুষ্টি, জন্মের পর পরিচর্যা, নবজাতকের পরিচর্যা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, শিশুর আহার ও পরিচর্যা এবং পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ করা। এইসব পদক্ষেপ সফল ও স্থিতিশীল করতে হলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও নারীর অধিকার সমুন্নত রাখে এমন পরিবেশের ও উন্নয়নের কৌশলগত কর্মসূচি নিতে হবে।

গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে ও প্রসব পরবর্তী সময়ে সেবাকেন্দ্রে অথবা দক্ষ সেবাদানকারীর কাছ থেকে সেবা গ্রহণ না করা, অদক্ষ হাতে বাড়িতে প্রসব করানো  এবং সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশি।

৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর শতকরা ৫৭ জনই মারা যায় জন্মের প্রথম মাসে এবং মোট নবজাতকের মৃত্যুর অর্ধেকই ঘটে জন্মের প্রথম দিনেই। এই কারণেই এমন একটি পরিবেশ/অবস্থা সৃষ্টি করা জরুরী যাতে একজন নারী তাঁর নিজ সিদ্ধান্তে গর্ভবতী হওয়ার পর গর্ভ ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সেবা নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে হলে গর্ভকালীন সেবা, নিরাপদ প্রসব ব্যবস্থা, জরুরী প্রসূতিসেবা এবং প্রসব পরবর্তী সেবাগুলো প্রাপ্তির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

## নিরাপদ মাতৃত্ব: প্রয়োজনীয় বিষয়

নিরাপদ মাতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ/অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে একজন নারী তাঁর নিজ সিদ্ধান্তে গর্ভবতী হওয়ার পর গর্ভ ও প্রসব সংক্রান্ত জটিলতা ও মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল সেবা নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে হলে নিম্নলিখিত সেবাগুলো প্রাপ্তির প্রতি বিশেষ জোর দিতে হবে-

- গর্ভকালীন সেবা
- নিরাপদ প্রসব ব্যবস্থা
- জরুরী প্রসূতি সেবা এবং
- প্রসব পরবর্তী সেবা

## গর্ভকালীন সেবা

সমগ্র গর্ভকালীন সময়ে অর্থাৎ মাসিক বন্ধ হওয়া থেকে শুরু করে ৯ মাস ৭ দিন (২৮০ দিন) পর্যন্ত গর্ভবতী মা এবং তার গর্ভের সন্তানের যত্ন নেওয়াকে গর্ভকালীন যত্ন বলা হয়। নিয়মিত পরীক্ষা, উপদেশ প্রদান ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে গর্ভকালীন যত্ন নিশ্চিত করা হয়। গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪বার গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা  বা সেবার জন্য নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে।

**গর্ভকালীন সময়ে একজন মায়ের চেকআপের সময়সূচি**

১ম সাক্ষাৎ/চেকআপ: ৪ মাসের মধ্যে (১৬ সপ্তাহ)
২য় সাক্ষাৎ/চেকআপ: ৬-৭ মাসে (২৪-২৮ সপ্তাহ)
৩য় সাক্ষাৎ/চেকআপ: ৮ মাসে (৩২ সপ্তাহ)
৪র্থ সাক্ষাৎ/চেকআপ: ৯ মাসে (৩৬ সপ্তাহ)

**গর্ভবতীর পুষ্টি ও গর্ভকালীন সময়ের যত্ন**

- গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন মূল খাবার ৩ বার এবং ২ বার নাস্তায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে
- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলিজা, ঘন ডাল, গাঢ় রঙিন ও সবুজ শাক-সব্জি এবং মৌসুমি দেশী ফল খেতে হবে। রান্নায় যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন-এ যুক্ত তেল ব্যবহার করতে হবে
- গর্ভাবস্থায় ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার খেতে হবে
- গর্ভাবস্থায় ৩ মাসের পর থেকে প্রতিদিন সকালে ১টি এবং দুপুরে ১টি মোট ২টি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ভরা পেটে খেতে হবে
- গর্ভাবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে (রাতে ৮ ঘন্টা ঘুম, দিনে কমপক্ষে ২ঘন্টা বিশ্রাম নিতে হবে এবং ভারী কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে)
- গর্ভবতী মাকে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তিতে রাখতে হবে, এতে গর্ভস্থ্ শিশুর বৃদ্ধি স্বাভাবিক হবে
- ভারী কাজ (যেমন; টিউবওয়েল চাপা, ধানভাঙ্গা, ভারী জিনিস তোলা, অতিরিক্ত/ভারী কাপড় ধোয়া) থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কষ্টকর পরিশ্রম বর্জন করতে হবে
- আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

**জানতে হবে/ প্রয়োজনীয় তথ্য**

- কোথায় প্রসব হবে/প্রসবের স্থান নির্ধারণ করা
- বাড়িতে প্রসবের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন দক্ষ প্রসব সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব করানো হবে তা নির্ধারণ করে রাখা
- জরুরী অবস্থায় কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবেন তা নির্বাচন করে রাখা
- জরুরী প্রয়োজনে পরিবহণের ব্যবস্থা করে রাখা
- জরুরী অবস্থায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবে এমন সঙ্গী নির্ধারণ করে রাখা
- অর্থ সঞ্চয় করে রাখা
- সেবাকেন্দ্রের/সেবাদানকারীর মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহে রাখা
- রক্তের গ্রুপ জানা ও রক্তদাতা সনাক্ত করে রাখা।

**প্রসব পরবর্তী সময় কতদিন?**

প্রসবের পর থেকে ৬ সপ্তাহ বা ৪২ দিন পর্যন্ত সময়কে প্রসব পরবর্তী সময় বলা হয়।

## প্রসব পরবর্তী সময়ে কখন কখন চেকআপে যেতে হবে?

শিশু জন্মের পর অন্তত চারবার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।

**মা ও নবজাতকের ৪বার প্রসব পরবর্তী সেবা দেয়া প্রয়োজন**

**প্রথম সাক্ষাৎ/চেকআপ :** প্রথম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে
**দ্বিতীয় সাক্ষাৎ/চেকআপ :** ২-৩ দিনের মধ্যে
**তৃতীয় সাক্ষাৎ/চেকআপ :** ৪-৭ দিনের মধ্যে
**চতুর্থ সাক্ষাৎ/চেকআপ :** প্রসবের ৪২-৪৫ দিনের মধ্যে

## প্রসূতি মায়ের কী কী যত্ন নিতে হবে?

প্রসব পরবর্তী সময়ে মায়ের দুধ খাওয়ানোর চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় নিচের খাবারগুলো থাকা প্রয়োজন:

- ডিম, মাংস, মাছ, দুধ, ডাল, সিমের বিচি, মটরশুটি ইত্যাদি
- প্রচুর পরিমাণে পানি এবং গাঢ় হলুদ ও সবুজ রঙের শাক-সবজি ও দেশীয় ফল
- প্রতিদিন ১ মুঠো অতিরিক্ত ভাত এবং ডাল
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে
- অবশ্যই আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে।

## গর্ভকালীন ৫টি জটিল অবস্থা

একজন গর্ভবতী মায়ের যেকোন সময় যেকোনো বিপদ দেখা দিতে পারে। পরিবারের সবার ৫টি বিপদচিহ্ন সম্পর্কে জেনে রাখতে হবে এবং যেকোনো একটি দেখা দেয়া মাত্র তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

- রক্তক্ষরণ
- প্রচন্ড জ্বর
- তীব্র মাথা ব্যথা এবং চোখে ঝাপসা দেখা
- খিঁচুনি
- অনেক সময় ধরে প্রসব বেদনা/বিলম্বিত প্রসব (১২ ঘন্টার অধিক সময় ধরে থাকলে)।

## নবজাতক

জন্মের পর থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয়।

**নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা কী**

শিশুর জন্মের পর থেকে ২৮ দিনের মধ্যে কিছু চিহ্নিত স্বাস্থ্যসেবা বা বিশেষ যত্নকে নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবা হিসেবে গণ্য করা হয় যা নবজাতকের সুস্বাস্থ্য, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর হার কমানো নিশ্চিত করে।

**নবজাতকের অত্যাবশ্যকীয় সেবাগুলো হলো নিম্নরূপ**

১. নিরাপদ ও পরিষ্কার প্রসব
২. নবজাতকের উষ্ণতা বজায় রাখা ও নিম্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধ করা
৩. নবজাতকের শ্বাস-প্রশ্বাস যাচাই করা ও প্রয়োজনে সহায়তা দেওয়া
৪. নবজাতকের জন্মের সাথে সাথে (১ ঘণ্টার মধ্যে) মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা
৫. কম জন্ম-ওজন এবং অপরিণত নবজাতকের জন্য বিশেষ যত্ন
৬. নবজাতকের বিপদ চিহ্ন সনাক্ত করে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও রেফার করা।

## নবজাতকের বিপদ চিহ্ন

জন্মের প্রথম ২৮ দিন পর্যন্ত নবজাতকের যেকোনো শারীরিক সমস্যা বা অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি খুব বেশি থাকে। নবজাতকের মারাত্মক অসুস্থতার উপসর্গকেই বিপদ চিহ্ন বলে।

- মায়ের দুধ খেতে না পারা বা না চোষা
- খিঁচুনি
- শান্ত অবস্থায় দ্রুত শ্বাস (মিনিটে ৬০ বার বা তার চেয়ে বেশি বার শ্বাস নেওয়া)
- বুকের খাঁচার নিচের অংশ মারাত্মকভাবে দেবে যাওয়া
- শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া বা জ্বর (৩৭.৫° সে. বা ৯৯.৫° ফা. এর বেশী)
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া বা জ্বর (৩৫.৫° সে. বা ৯৫.৯° ফা. এর কম)
- নেতিয়ে পড়া বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম নড়াচড়া করা (উদ্দীপ্ত করা ব্যতীত শিশু নড়াচড়া করে না অথবা একেবারেই নড়াচড়া করে না)
- নাভী পাকা ও চারপাশ লালবর্ণ ধারণ করা।

# ১১.

# জেন্ডার ও নারীর প্রতি সহিংসতা

## জেন্ডার ধারণা

ছেলে ও মেয়ে শিশু উভয়ই সমান সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধুমাত্র শারীরিক গঠনে এবং শরীরবৃত্তীয় কাজে কিছু পার্থক্য থাকে যা প্রাকৃতিক। শারীরিক এই পার্থক্যের কারণে মেয়েরা গর্ভধারণ করে, সন্তান জন্ম দিতে পারে, অন্যদিকে পুরুষরা ভ্রূণ উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্য প্রকৃতিগত, যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে, সমাজ নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন: বহুদিন ধরে মেয়েরা ঘরের কাজ, রান্না, সন্তান লালন-পালন, এই সব গৃহস্থালী কাজ করে আসছে, যার বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নেওয়া বা দেওয়া হয় না। অন্যদিকে পুরুষরা আয়-উপার্জন, বিচার-সালিশ, রাজনীতি ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকেন। পুরুষ ও নারীদের সাজ-সজ্জা, আচার আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদও আলাদা। নারী ও পুরুষের অধিকারও এক নয়। পুরুষ ও নারীর উপর সামাজিকভাবে আরোপিত এই পরিচয় বা ভূমিকাকেই জেন্ডার বলে।

**নারী নির্যাতন**

নারী নির্যাতন হলো এমন একটি আচরণ যা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে শারীরিক জৈবিক ও মানসিক যন্ত্রণার উদ্রেক করে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, হুমকি, বল প্রয়োগ কিংবা অন্য কোনো উপায়ে কোনো নারীকে আতঙ্কিত করতে, শাস্তি দিতে, অপমানিত করতে, তার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য হ্রাস করতে অথবা আত্মসম্মানবোধ ও শরীরের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মর্যাদাকে উপেক্ষা করে ছক বাঁধা নিয়মে জীবন পরিচালিত করতে বাধ্য করে।

নারী নির্যাতন কেবল শারীরিক আঘাত বা যৌন নিপীড়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শারীরিক নির্যাতনের আকারেই শুধু নারী নির্যাতন সংঘটিত হয় না , নারীরা নানা মানসিক আঘাতেরও শিকার হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র মূলত এই তিনটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন সংঘটিত হয়ে থাকে।

সহিংসতা কি? সহিংসতা বলতে আমরা বুঝি অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, অতিরিক্ত শাসন, যৌন হয়রানি ইত্যাদি।

নারীর প্রতি চার ধরনের সহিংসতা

- শারীরিক আঘাত
- মানসিক আঘাত
- অবহেলা
- কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা

নির্যাতনের কুফলসমূহ:

- সংসারে অশান্তি/কলহ
- বিবাহ-বিচ্ছেদ
- সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন
- শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া
- কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য
- নিম্ন পারিশ্রমিক
- সন্তান ধারণে বাধা
- অপবাদ/সমাজে মুখ দেখাতে না পারা
- সকল কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ না থাকা।

## কিভাবে নির্যাতন কমানো/প্রতিরোধ করা যায়

- যথা শিগগিরই নারী নির্যাতনকারী অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি বা রাজনৈতিক দলের পরিচয়, ক্ষমতা বা অন্য কোনো প্রভাবে বা কোনো পরিচয়ে সঠিক বিচার যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে ইন্টারনেটযুক্ত মোবাইল ফোন, আইপ্যাড, ভিডিও প্লেয়ার বা এমন মোবাইল ডিভাইস দেয়া যাবে না, যার দ্বারা সে পর্নোগ্রাফি বা অন্য কোনো অশ্লীল বা আসক্তিকর কিছু দেখতে পারে।
- উচ্চপর্যায়ের আইসিটি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় সব ধরনের পর্নোগ্রাফিক সাইট বন্ধ করতে হবে। পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। গান, নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন মিডিয়া থেকে অশ্লীলতাকে চিরবিদায় দিতে হবে।
- পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, মিডিয়া ও বাস্তব জীবনের অনুষ্ঠানাদিতে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। অবাধ যৌনাচার, অশ্লীল দৃশ্য বা কোনো যৌন উদ্দীপক দৃশ্য, অনুষ্ঠান বা বক্তব্য যে সব ওয়েবসাইট, টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও বা অন্য কোনো মিডিয়া উপস্থাপন করে, সেগুলোকে আমাদের দেশে নিষিদ্ধ করতে হবে।
- বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ব্যাপক হারে সিসিটিভি স্থাপন করতে হবে।
- আইনসম্মত নয় এবং ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত নয়, এমন অবাধ যৌনাচারে নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই লিভ টুগেদারসহ বিয়ে বহির্ভূত সব ধরনের যৌনাচার বন্ধ করতে হবে।
- দেশের বাস্তবতা বিবেচনা করেই একান্ত প্রয়োজনীয় 'যৌনশিক্ষা' দেয়া উচিত
- সবার মধ্যে ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, বিভিন্ন মিডিয়া এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা নিতে হবে।
- বিভিন্ন অফিস ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং যাতায়াতে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতন বিরোধী সেল গঠন করতে হবে।
- সব ধরনের ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করতে হবে, অশালীনতা বন্ধ করতে হবে এবং নারীদের জন্য নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- ধর্মের নামে গোঁড়ামি, ভন্ডামি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে না।

## নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বা নারী ও পুরুষের মধ্যে সমাজের তৈরি এই পার্থক্যের ফলে নারীরা পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের বৈষম্যমূলক সামাজিক ভূমিকা ও আচার আচরণ। তবে যুগের প্রয়োজনে বর্তমানে নারীরা শিক্ষা, রাজনীতি এবং আয় উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে ধীরে ধীরে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনের পথে রয়েছে বলা যায়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ বৈষম্য ও বঞ্চনা ব্যাপকতর। নারী-পুরুষের দৈহিক পার্থক্য থেকে জেন্ডার ভিন্নতা সৃষ্টি হয় না- জেন্ডার ভিন্নতা বা বৈষম্য সৃষ্টি হয় সামাজিকভাবে সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে। লক্ষণীয় দিকগুলো হলো- প্রথমতঃ শ্রম বিভাজন (যেমনঃ দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব, ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা অসমতা), দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তি ভোগ, পছন্দ ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সামাজিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারসমূহ। মূলত সমাজ এবং তার প্রচলিত ব্যবস্থাই ধীরে ধীরে নারী ও পুরুষের মাঝে অসম সম্পর্ককে সৃষ্টি করছে এবং তা বাড়াচ্ছে।

পরিবারে প্রচলিত ও বিদ্যমান অসম বা বৈষম্যমূলক অভ্যন্তরীণ কাঠামো, রীতি-নীতি ও প্রথার প্রতিফলন ঘটে সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রে যেখানে পুরুষরাই প্রাধান্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব করে। পরিবারের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে পুরুষগণ প্রাধান্য বিস্তার করে আর নারীরা পারিবারিক অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্যস্ত থাকে।

## নারীর বয়সভিত্তিক জেন্ডার বৈষম্যের ক্ষেত্র

আমাদের দেশে জন্মের আগে থেকেই একজন নারী জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। এই বৈষম্যের ধরণ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আমাদের পরিবারগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়, তারা ছেলেকে বেশি খাবার দেন, কিন্তু মেয়ের পর্যাপ্ত খাবারের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন, ফলে মেয়েটি অপুষ্টিতে ভোগে। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে ওঠে। অথচ ভবিষ্যতের মা হিসেবে কিশোরীর জন্য পুষ্টি নিশ্চিত করা অনেক বেশি জরুরি । আবার বাবা-মা বা সমাজ মনে করে সে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হয়েছে, সুতরাং তার আর লেখাপড়ার দরকার নেই। এছাড়াও রাস্তাঘাটে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাবে অনেক সময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে জীবন গঠনে বা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে একটি মেয়ে ছেলেদের চাইতে বরাবরই পিছিয়ে পড়ে।

স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও মেয়েরা অবহেলার শিকার হয়। এমনকি গর্ভবস্থায়ও তার সঠিক যত্ন নেয়া হয় না। ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায় । স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও থাকে না।

দেখা যায় ছোট বেলা থেকেই একটি মেয়েকে পরিবারে খাটো করে দেখা হয়। ফলে কাজের স্বীকৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাকে অবহেলা করা হয়। এভাবে মর্যাদাহীনভাবে বেড়ে উঠতে উঠতে নারীরা মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো নিজের মর্যাদা বা অধিকারও বুঝতে পারে না।

পারিবারিক পর্যায়ে ছোট বড় কোনো ধরনের কাজেই নারীদের মতামতের মূল্য অনেক পরিবারের সদস্যরা দেন না। যেমন, মেয়ের অমতে বিয়ে দেয়া, অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া, লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিশতে না দেয়া, খেলাধুলা করতে না দেয়া, পরিবারের কোনো বিষয়ে তার মতামত না নেওয়া ইত্যাদি।

আমাদের দেশে অনেক সময় পরিবারে মেয়েরা তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দেশের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মুসলিম পরিবারে মেয়ে সন্তান ছেলে সন্তানের তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি পায়। কিন্তু নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে ধরে নেন সম্পত্তিতে শুধুমাত্র ছেলেদেরই অধিকার রয়েছে। অনেক সময় পারিবারিক ও সামাজিক চাপে মেয়েদের এটা মেনে নিতে হয়।

আবার যেসব নারীরা এসব বাধা ডিঙ্গিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাদেরকেও বৈষম্যের শিকার হতে হয়। দেখা যায় একটি নারী ও একটি পুরুষ একই কাজ করছে কিন্তু তাদেরকে পারিশ্রমিক একই রকম দেয়া হচ্ছে না। নারীরা যখন গর্ভবতী হচ্ছে তখন অনেক ক্ষেত্রে তাকে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে না। এমনকি কখনও কখনও নারীরা চাকুরি হারাচ্ছেন। অথচ কর্মসংস্থান এবং সমান সুযোগ সকল মানুষের মৌলিক অধিকার। গৃহস্থালীতে নারীদের কাজেরও কোন মূল্যায়ন হয় না। আমাদের দেশের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার যেমন: কখন এবং কয়টি সন্তান নিতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার থেকে নারীরা প্রায়ই বঞ্চিত হন।

| **বয়সভিত্তিক স্তর** | **জেন্ডার বৈষম্য** |
|---|---|
| জন্মপূর্ব ও জন্মকালে | মা ও শিশুর কম খাদ্যগ্রহণ, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবার অভাব ইত্যাদি |
| শৈশবকাল | অযত্ন, অবহেলা, বঞ্চনা, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ কম, বৈষম্যমূলক আচরণ, কন্যা শিশুর প্রতি অবহেলা |
| বয়ঃসন্ধিকাল | প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নেই, গতানুগতিক গৃহস্থালী কাজে ভূমিকা, বাল্য বিবাহ, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, পুরুষের প্রাধান্য, নারীদের নিরাপত্তাহীনতা, আয় ও কর্মসংস্থান কম |
| যৌবনকাল ও প্রাপ্ত বয়স্ক | মৌলিক অধিকারের অভাব, মতামত, পছন্দ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের আধিপত্য, সম্পদ ও সম্পত্তির ভোগ ও মালিকানায় বৈষম্য, সামাজিক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীর কম অংশীদারিত্ব, নেতৃত্বদানে নারীর সীমাবদ্ধতা, সুস্থ সাংস্কৃতিক বিনোদন কার্যক্রমে নারীর সুযোগ কম |
| বৃদ্ধকাল | নির্ভরশীলতা, নিরাপত্তাহীনতা, সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানা বৈষম্য, সামাজিক/ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের অভাব ইত্যাদি |

## পরিবার ও সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব

জেন্ডার বৈষম্যের কারণে পরিবারে পুত্র সন্তানের অগ্রাধিকার থাকে এবং কন্যা সন্তানের মূল্যায়ন কম হয়। মেয়েরা কম পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য খায় ফলে তারা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকে ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি। যৌতুকের কারণে মেয়েদের বাল্যবিবাহ দিয়ে দেয়া হয়।

নারীর উপর আরোপিত ক্ষতিকারক সামাজিক প্রথার কারণে নারীদের অসুস্থতা, অধিক মাতৃমৃত্যু হার, পরিবারে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ও প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি নির্যাতন বিরাজমান থাকে যা শেষ পর্যন্ত নারীকে মানসিকভাবে অসুস্থ করে ফেলে এবং নারীর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কম থাকার কারণে এবং নারী পুরুষের অসম শ্রম বিভাজন ও সম্পদ বন্টণ ব্যবস্থা বিরাজ থাকার কারণে নারীকে সব সময় পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তার কোনো অবদান থাকে না।

পরিবার ও সমাজে জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব নিম্নরূপ:

- একজন মেয়ে শিশু ঠিক তার জন্মের পূর্ব থেকেই নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ক বৈষম্যের শিকার হয়। বাবা-মায়ের অজ্ঞতা ও গতানুগতিক মূল্যবোধের কারণে বেশীর ভাগ মা-বাবাই মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করলে খুশী হন না
- ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা কম খাদ্য ও পুষ্টি পায়
- গর্ভবতী মা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি পান না
- নারীরাই প্রধানত জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে ফলে স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের শিকার হন
- নারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায় না
- নারী ও পুরুষের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতায় পার্থক্য সৃষ্টি হয়, ফলে নারী পিছিয়ে পড়ে
- বাল্য বিবাহ, তালাক, যৌতুক ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়
- নারীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়
- নারী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন
- শিশুদের শরীর ও মেধার সুষ্ঠু বিকাশ হয় না।

## পরিবারে বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে করণীয়

বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে সর্বাগ্রে যে কাজটি করতে হবে তা হলো জেন্ডার সংবেদনশীল সমাজ গঠন। জেন্ডার সংবেদনশীলতা বলতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান সহমর্মিতার প্রকাশ বা অনুভূতিকেই বোঝায়। জেন্ডার সংবেদনশীলতা মানুষকে অধিকার সচেতন হতে এবং সকল প্রকার অন্যায়, অবিচারের প্রতি প্রতিবাদ করতে শেখায়। মানুষের বিবেকবোধ জাগিয়ে তোলে।

নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হবে । পাশাপাশি অভিভাবকদেরকে বুঝতে হবে যে, একজন নারীও সুযোগ পেলে পুরুষের মতো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী একজন কিশোরীকে লেখাপড়া শিখে তৈরি হতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে একজন পুরুষের পাশাপাশি তারাও মাথা উঁচু করে সমানভাবে চলতে পারে।

পরিবারের এবং সমাজের নারী সদস্যদের প্রতি ছোটবেলা থেকেই শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। একজন কিশোরকে বা একজন পুরুষকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার পরিবারের নারীরা যেন বৈষম্যর শিকার না হন। কিশোরী সদস্য যেন তার মতোই খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা, মতামত দেয়ার স্বাধীনতা, মান মর্যাদা ইত্যাদি পায়। রাস্তাঘাটে কিশোরীদের উত্যক্ত করা, বাজে মন্তব্য বা ইভটিজিং/টিটকারি করা বন্ধ করে নারীর বিচরণ ক্ষেত্র সম্পূর্ণ নিরাপদ করতে হবে। ছেলে ও মেয়ের সমান সুযোগ পাওয়ার যে অধিকার রয়েছে তা পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের সকলকে বুঝতে হবে এবং ছেলে মেয়েদেরকে সমান সুযোগ দিতে হবে। রাষ্ট্র এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে সরকার ইতোমধ্যে নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এর সুফল একজন নারী, তার পরিবার এবং সমাজের পাওয়া শুরু হয়েছে।

**ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিকভাবে নিচের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে বৈষম্য দূর করা যায়:**

- নারীদের উচ্চশিক্ষা ও দায়িত্বশীল কাজের ব্যাপারে বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহিত করা
- সংসারের উন্নতি ও শান্তির জন্য স্বামী-স্ত্রী ভাগাভাগি করে সব কাজ করা
- স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা
- নারীকে বাইরের কাজ করার ক্ষেত্রে মানসিক সহযোগিতা দেয়া
- পরিবার ও এর বাইরে প্রতিটি নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো
- কর্মক্ষেত্রে নারী সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা/সম্মান প্রদর্শন করা
- নারীরা যেমন সন্তান ধারণ ও পালনের পাশাপাশি পারিবারিক, পেশাগত ও অন্যান্য উপার্জনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তেমনি পুরুষেরও উচিত সন্তান পালন ও গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করা
- গর্ভবতী মাকে যথাযথ খাদ্যগ্রহণ ও বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ করে দেয়া
- গর্ভ ও প্রসবকালীন সময়ে নারীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

## জেন্ডার বৈষম্য দূর করার উপায় এবং পুরুষের ইতিবাচক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার উপায়

গর্ভবতী, প্রসূতি ও নবজাতকের যত্নসহ অন্যান্য সাংসারিক কাজে পুরুষের ভূমিকা রাখা বা না রাখার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় কাজ করে। আমাদের প্রচলিত বাঁধাধরা সামাজিক প্রথায় মনে করা হয় যে, গৃহস্থালীর কাজ বা সন্তান জন্ম দেয়া, লালন-পালনের কাজ হচ্ছে নারীদের কাজ। গৃহস্থালীর অধিক সময়ের কাজ যেমন: খাবার তৈরি, ঘর পরিষ্কার, থালা-বাসন ধোয়া, কাপড় ধোয়া এবং ইস্ত্রি করা মনে করা হয় নারীদের কাজ। সংসার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী দু'জনার, তাই সংসারের কাজ কেন শুধু নারীর? সমাজে প্রচলিত চর্চা যা বৈষম্য তৈরি করছে তা নিরসনে নিচের কাজগুলো করা যেতে পারে

- স্ত্রী, স্বামীর কাজের প্রশংসা করে তাদেরকে ঘরের কাজের উৎসাহ দিতে পারেন। যেমন: তোমার রান্না খুব সুস্বাদু হয়েছে বা তুমি খুব চমৎকার চা বানাও ইত্যাদি প্রশংসা স্বামীকে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে
- রাগ বা ঝগড়া হলে একে অপরকে দোষারোপ না করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মাধ্যমে দু'জন আলোচনা করুন। মনে রাখতে হবে যে আলোচনার সময় যেন কোনোভাবেই সমালোচনা না করা হয়
- সমস্যাটিকে একটি সমস্যা হিসাবে উপস্থাপন করুন যার জন্য আপনার সহায়তা প্রয়োজন। নিজের মনে করে গৃহকর্মের কাজে গুরুত্ব দিতে উৎসাহিত করুন
- আলাদা করে এই আলোচনা না করে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করুন। উৎসাহ দিন এবং মায়াময় স্বরে আলোচনা করুন। কোনোভাবেই দোষারোপ করবেন না। এতে করে পুরুষ নিজেকে প্রতিপক্ষ ভাববে এবং তার নিজের স্বপক্ষে যুক্তি বের করবে
- সমালোচনা না করে তিনি যে ছোট-ছোট কাজ করেছেন তার প্রশংসা করুন। কোন কাজ না করলে বা করতে না পারলে বকাবকি না করে তাকে সহায়তা করুন
- খুব দ্রুত পরিবর্তন আশা করবেন না। অনেক নারী আছেন যারা নিজেরাও মনে করেন যে এসব কাজ পুরুষের না। হাজার বছর থেকে পুরুষরা এসব কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন আছে। একটু একটু করে পরিবর্তন করুন এবং তা ধরে রাখতে সাহায্য করুন
- সংসারে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুকে সমানভাবে দেখুন এবং দু'জনকেই গৃহস্থালীর কাজ করতে দায়িত্বশীল করে  তুলুন যাতে ভবিষ্যতে তারা তাদের করণীয় সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়।

# ১২.

# সন্তানের অভিভাবক হিসাবে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ

**পুরুষের অংশগ্রহণ**

নারী ও পুরুষ উভয়কেই সন্তান লালন-পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। স্ত্রীর গর্ভধারণের পূর্ব থেকেই একজন স্বামীকে অনাগত সন্তান ও মায়ের সুস্থতার জন্য কি কি দায়িত্ব পালন করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে শিশুর ও মায়ের পরিপূর্ণ সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এই সময় স্বামীকে স্ত্রীর কাজ ভাগ করে নিতে হবে। রান্নার কাজ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ঘর গোছানো, আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখা, বাগান করা ইত্যাদি কাজ যখন একজন পুরুষ দায়িত্ব নিয়ে করে তখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক তৈরি হয়।

## যেভাবে একজন বাবা বা মা সন্তানের ভালো অভিভাবক হয়ে উঠতে পারেন

সন্তান যখন জন্ম নেয় তখন সে নিষ্পাপ থাকে, মা-বাবার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, এই কারণে বাবা-মাকে সব সময় সন্তানের কল্যাণের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। সব সময় মনে রাখতে হবে যে উপদেশের চেয়ে কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করাটা জরুরি। দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অমনোযোগী বাবা-মা কখনোই সন্তানকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন না।

বাবাকে মা ও সন্তানের সুস্থতার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা, স্বাস্থ্যসেবা ও সুস্থতার নির্দেশনাবলী সম্পর্কে সচেতন থাকা, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কে ধারণা থাকা, শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা, শিশুর সাথে খেলাধূলা করা, সময় দেয়া, স্নেহ-মমতা প্রদান করা ও আদর করা। এই সবগুলো বিষয়ই বাবা-মাকে তাঁদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও করতে হবে।

একটি শিশু জন্মের পর থেকে কৈশোরকাল পর্যন্ত বয়সটি বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসে। এসময় তারা শুধু শারীরিকভাবেই বাড়েনা বরং তাদের চিন্তার জগতেও পরিবর্তন হয়। এই কারণেই বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভালো অভিভাবক মানেই হচ্ছে সন্তানকে সুখী, আত্মবিশ্বাসী এবং সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় করে গড়ে তোলা। এ জন্য প্রয়োজন শৈশব থেকে শিশুর মৌলিক প্রয়োজন মেটানো ও তাদের ভালো খাবারের দিকে নজর রাখা। শিশুদের এরকম একটি শৈশব উপহার দেয়ার জন্য বাবা-মাকে অবশ্যই শিশুদের বিভিন্ন সময়ের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, শিশুদের চিন্তা, চাহিদা এবং সেই অনুযায়ী তাদের কি করণীয় সে সম্পর্ক সম্পূর্ণ সচেতন থাকা উচিত। পারাস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, উৎসাহ/অনুপ্রেরণা এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে সন্তানকে বেড়ে উঠতে সহায়তা করা। এই মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পর্যায়ে বাবা-মাকে তাদের সততা, স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা চর্চা শিশুদের উপর প্রভাব ফেলবে যা শিশুটির নিজের জীবন গঠনেও ভূমিকা রাখবে।

বাবা-মা যেমন সন্তানের কাছ থেকে সম্মান আশা করেন, সন্তানও বাবা-মায়ের কাছে সম্মান আশা করে। ছোট থেকেই শিশুদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয় এবং প্রকট থাকে। এই সময় তাকে সম্মানিত করা এবং অন্যের সামনে প্রশংসা করা তাকে আরও উজ্জীবিত ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে। যেমন: সে খুব ভালো

ছাত্র, সে খেলায় খুব ভালো, সে খুব ভালো বলতে পারে, কবিতা আবৃত্তি করতে পারে বা খুব ভালো গান গাইতে পারে  ইত্যাদি।

শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সহায়তা করলে শিশুর আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদা বাড়ে। বাবা-মাকে শিশুর ভুল ধরা, কটাক্ষ করা বা কটুক্তি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যদের সামনে শিশুকে লজ্জা দেয়া বা বকা দেয়া যাবে না।

শিশুরা পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রশংসা ও সমর্থন পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। তাদের ক্ষমতা, দক্ষতা ও প্রতিভা অনুযায়ী প্রশংসা করলে তাদের নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়।

আপনার মনের মধ্যে হয়তো সন্তানের জন্য গভীর মমতা বা ভালোবাসা আছে, কিন্তু এটা আপনার সন্তানের কোন কাজে লাগবে না যদি তা দৃশ্যমান না হয়। ভালোবাসা মানেই কিন্তু শুধুমাত্র সন্তানের চাহিদা অনুযায়ী বই, পেন্সিল, খেলনা কিনে দেয়া না বরং তাদের অনুভব করান যে আপনি তাকে ভালোবাসেন।

বাবা-মাকে অবশ্যই সন্তানকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, সন্তানের সাথে খেলাধূলা করা করার সময় বের করতে হবে এবং তাদেরকে সব সময় আদর করে ডাকতে হবে। সন্তানের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য না করে মেয়ে সন্তানকেও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করতে হবে।

## বাবার সাথে সন্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার গুরুত্ব

- যে বাবারা সন্তানের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন এবং সন্তানকে বেড়ে ওঠার প্রতিটি পদক্ষেপে নিরাপদ রাখতে পারেন, বড় হয়ে সেই সন্তানেরা পরবর্তীতে সুখী ও আনন্দময় জীবন কাটায়
- বিভিন্ন জীবন দক্ষতা বেড়ে ওঠে এবং জীবনে চাপ ও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে
- সন্তানের মানসিক ও ভাষাগত উন্নয়ন হয়
- সন্তান আশাবাদী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে
- উন্নত সামাজিক ও একাডেমিক দক্ষতার ভিত্তি তৈরি হয়
- একটি নিরাপদ সম্পর্ক সুস্থ সামাজিক, মানসিক, জ্ঞানীয় এবং প্রেরণামূলক উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করে
- বাবা-মায়ের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক থাকলেও শিশুরা সমস্যা সমাধানের দক্ষতা লাভ করে।

## সন্তানের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বাবার ভূমিকা

- সন্তান নেওয়ার সঠিক পরিকল্পনা করা
- গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করা
- পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত করা
- মা, নবজাতক ও শিশুর যত্নসহ সাংসারিক কাজে নারীর শ্রম চিহ্নিত করে এর স্বীকৃতি এবং মায়ের কাজের চাপ কমাতে দায়িত্ব পুনর্বন্টন
- বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করুন, আপনি যদি বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাহলে আপনার সন্তানও তাই শিখবে
- ছোটবেলা থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন
- সন্তানদের সামনে কখনই ঝগড়া করা ঠিক না, কারণ এতে সন্তানদের উপর খুব বিরূপ প্রভাব পড়ে
- সন্তানদের সাথে সময় কাটান, আপনি যতই ব্যস্ত থাকুন সন্তানদের যদি সময় না দেন তাহলে আপনার সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়বে। তাদের একাকীত্ব বাড়বে যার ফল কখনো ভালো হবে না

- ভালো শ্রোতা হোন, সন্তানদের কথা অপ্রয়োজনীয় হলেও মন দিয়ে শুনুন। এতে ওর সব কথা আপনার সঙ্গে শেয়ার করার অভ্যাস তৈরি হবে
- ভুল করলে সঠিকভাবে শুধরে দিন, বাচ্চারা ভুল করবেই তাই বলে তাদের বকাঝকা না করে বুঝিয়ে বলুন কী করলে ঠিক হবে। তাহলে সে কাজ করার আগ্রহ পাবে
- সন্তানদের বিশ্বাস করুন। তারা যদি বুঝতে পারে আপনি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস করেন তাহলে তারা অবিশ্বাসের কাজ করার চেষ্টা করবে না।
- সব সন্তানকেই দেখুন সমান চোখে, একজনকে বেশি ভালোবাসেন একজনকে কম এমন হলে বাচ্চাদের মাঝে হীনমন্যতা, প্রতিহিংসা জন্ম নেয়
- প্রশংসা করুন, বাচ্চাদের ছোট ছোট বিষয়ে প্রশংসা করলে তারা ভালো কাজ করার আগ্রহ পাবে। খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকবে।
- চাপ দিয়ে কিছু করানো থেকে দূরে থাকুন, যেটা বাচ্চারা মন থেকে করতে চাইবে না সেটা করাতে গেলে হিতে-বিপরীত হতে পারে
- আপনি আপনার সন্তানের জন্যে, আপনার জন্যে এবং আপনার পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্যে যা ভালো তাই করুন। মনে রাখবেন আজ আপনি যে বীজ বুনবেন ভবিষ্যতে আপনি সেই ফলই পাবেন।

## প্রসূতি ও নবজাতকের যত্নে পুরুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশে দেখা যায় যে, পরিবার ও সমাজে পুরুষেরাই প্রধানত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। প্রতিদিনের পারিবারিক সিদ্ধান্ত ছাড়াও আর্থিক সম্পদের বণ্টন, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মবিরতি বিষয়ে তাঁরাই মূল সিদ্ধান্তদাতা। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবাকে আমাদের সমাজে শুধুমাত্র নারীর দায়িত্ব বলেই মনে করা হয় এবং দায়িত্ব গ্রহণ ও সেবাযত্নের ক্ষেত্রে পুরুষেরা দূরে থাকে। এতে করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে পুরুষ এবং ছেলেদের জ্ঞান একদমই কম থাকে। স্বাস্থ্যসেবা না নেয়ার ঝুঁকি বা কি কি সমস্যা হতে পারে সেবিষয়ে তাদের ধারণা না থাকায় প্রসবপূর্ব সেবা, প্রসব প্রস্তুতি পরিকল্পনা, নিরাপদ প্রসব, প্রসব পরবর্তী সেবা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবায় তাদের করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকে। এর ফলে মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবাসংক্রান্ত চলমান এই প্রক্রিয়ায় নারী ও মেয়েদের প্রতি সমর্থনও খুব কম থাকে এবং এতে তাদের অংশগ্রহণও কমে যায়।

- বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এটা এখন স্বীকৃত যে গর্ভবতী, প্রসব, প্রসব পরবর্তী মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে পুরুষের অংশগ্রহণ। পুরুষরা যদি গর্ভকালীন সময়ে, প্রসব পরিকল্পনা, প্রসব পরবর্তী সময়ে মা ও শিশুর যত্নে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারেন তাহলে তাঁদের অংশগ্রহণ বাড়ে।
- গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং নবজাতকের বিপদসংকেত সম্পর্কে পুরুষের সঠিক জ্ঞান থাকলে তাঁরা সঠিক সময়ে জরুরি সেবা নিতে সহায়তা করতে পারেন।
- গর্ভ পরবর্তী সময়ে সাংসারিক কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ থাকলে তা নারীকে নবজাতক ও শিশুর পূর্ণ ছয়মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং গর্ভ পরবর্তী সময়ে স্ত্রীর মানসিক অবসাদ দূর করতেও পুরুষের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

**প্রসূতি মা, নবজাতক ও শিশুর স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত ও উন্নত করতে পুরুষের কার্যকর ভূমিকা**

- পরিবারকে একটি সুন্দর আগামীর পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে যৌথ পরিকল্পনা করা।
- গর্ভকালীন, প্রসব বেদনা, এবং প্রসবকালীন সময়ে স্ত্রীর পাশে থাকা এবং এই সময় মায়ের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জানা এবং সেই অনুযায়ী তাঁকে সহায়তা করা। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক তৈরি হবে এবং গৃহস্থালীর কাজে পুরুষের অংশগ্রহণ বাড়বে।
- প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণের সময় স্ত্রীর সাথে সেবাকেন্দ্রে যাওয়া ও প্রসব পরিকল্পনা করা। এতে পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পুরুষকে কোথায় কোথায় সহায়তা করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে

সহায়তা করতে পারবে।

- নিরাপদ ও সুস্থ সন্তানের জন্ম যেন হয় তার জন্য গর্ভকালীন সময় এবং প্রসবকালীন সময় স্ত্রীর কোনো জটিলতা দেখা দিলে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া।
- নবজাতকের যেকোনো জটিলতা দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া।
- সন্তানের দেখাশোনা ও লালন-পালনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া। প্রত্যেকদিন সন্তানের জীবনে একটি অর্থবহ ভূমিকা পালন করা এবং সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা।
- পূর্ণ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মা যাতে সন্তানকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান তার জন্য মায়ের গৃহস্থালীর কাজে সহায়তা করা।

### জন্ম বিরতিতে পুরুষরা কিভাবে সহায়তা করতে পারে?

পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের সময় নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে স্ত্রীর সাথে যাওয়া এবং পরামর্শ করা আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের গুরুত্ব, কে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবে বা দেরি করে সন্তান নেয়া বা একাধিক সন্তান নেওয়ার মাঝে কতটুকু সময় নেবে সে বিষয়ে দু'জনের মধ্যে কথা বলা।

### মেয়ে সন্তানের বেড়ে ওঠার বাধা দূর করতে বাবার ভূমিকা

- পুষ্টিকর খাবার খেতে দেয়া ও অসুস্থ হলে চিকিৎসা করা
- বাল্যবিবাহ না দেয়া
- জেন্ডার বৈষম্য না করা
- পড়ালেখা করার সুযোগ করে দেয়া
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধা না দেয়া
- বেড়াতে নিয়ে যাওয়া
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেয়া
- প্রয়োজন অনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া
- সকল কাজে উৎসাহিত করা
- মেয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশের সুরক্ষা করা।

আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৫৫০১২৩৫০, ০২-৮১৮৯৩৮৭, ফ্যাক্স: ৮১৫১০৭৪